প্রলয় দানব সুনামি

বিপুল সাহা

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স

৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

Pralaya Danab Tsunami
by *Bipul Saha*
Published by
Samir Kumar Nath
Nath Publishing
26B, Panditia Place, Kolkata - 700 029

Price : 15.00

প্রকাশ কাল ঃ জানুয়ারী, ২০০৫

গ্রন্থসত্ত্ব ঃ ভারতী সাহা

প্রকাশক ঃ সমীর কুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি, পণ্ডিতিয়া পে-স, কলকাতা - ৭০০ ০২৯

অ(রবিন্যাস ও মুদ্রণ ঃ অনিশা, ১৩২এ/১/ডব্লু, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৮৫

প্রচ্ছদ ও চিত্র ঃ পম্পা দত্ত

দাম ঃ ১৫ টাকা

সুনামিতে হারিয়ে যাওয়া মানুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

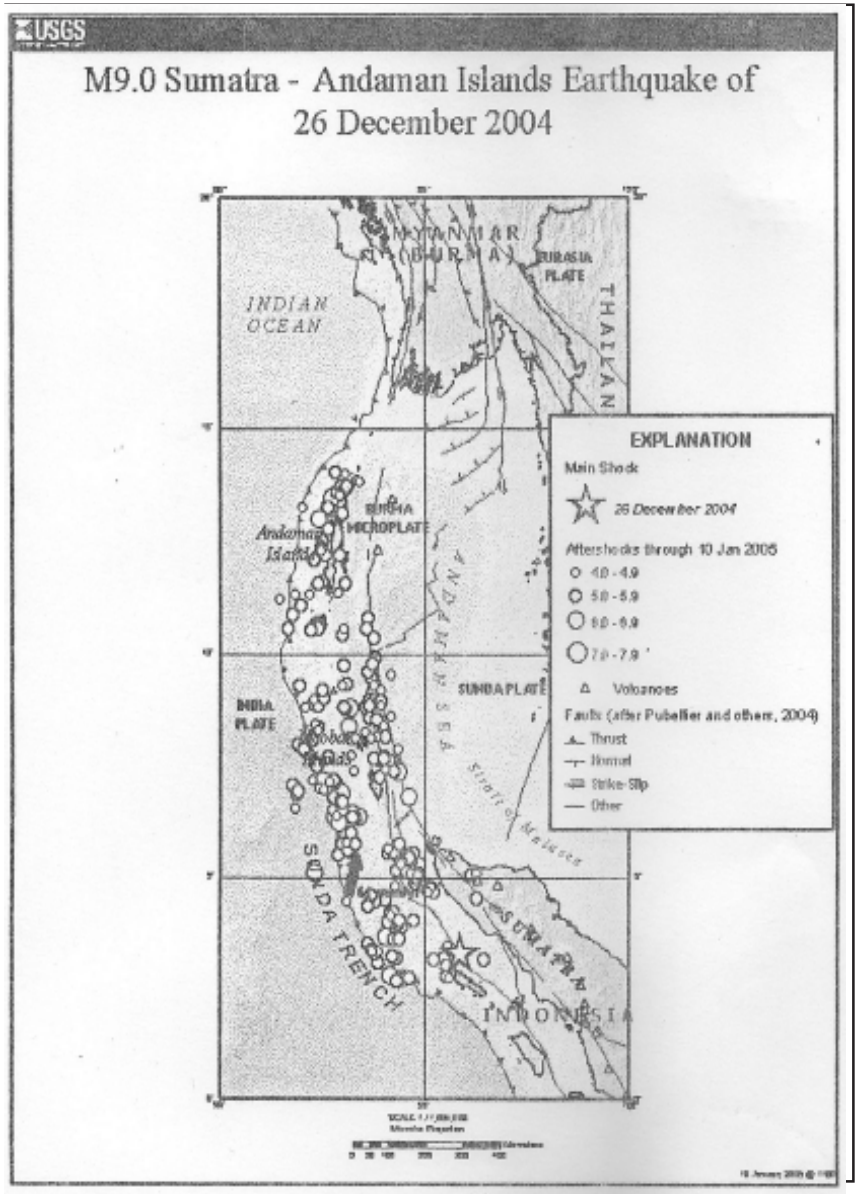

চিত্র-১। ২৬শে ডিসেম্বরে সুমাত্রা ভূকম্প এবং পরবর্তী কম্পন।
(মার্কিন ভূতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে)

প্রলয় দানব সুনামি
— বিপুল সাহা

১। সুনামি এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়

প্রকৃতির প্রলয়ের কাছে মানুষ আজো কত অসহায় আরেকবার সেকথা টের পাওয়া গেল। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণ, সাইক্লোন — এমন নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে এদেশে সাম্প্রতিক সংযোজন সুনামি, যার কথা আমরা প্রায় জানতামই না। না, এ ঈশ্বরের রোষ নয়, মানুষের পাপের ফলাফল নয়। এ এক প্রবল জলোচ্ছ্বাস। এক সামুদ্রিক তুফান যা ধেয়ে আসে ডাঙার দিকে। এক সমুদ্র দানবের হঠাৎ জেগে ওঠা তার সমস্ত আক্রোশ আছড়ে পড়ে স্থলভূমির উপর।

ভেলানকান্নি শহরটা নাগাপত্তিনম থেকে ১৫ কিমি দূরে। সেখানে প্রাচীন রোমান ক্যাথলিক গীর্জার যাজক রেভারেণ্ড ফাদার মুথুস্বামী ও ভক্ত(রা বলেছেন — এ ঘটনা পাপের শাস্তি(বড্ড বিপনন-কেন্দ্রিক হয়েছিল সবকিছু(মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে বসেছে(সমুদ্র সৈন্য পাঠিয়েছে শি'খখা' দিতে।

না না, সেসব কিছু নয়। মানুষ পাপ করে চলেছে বটে তবে তা মানুষের মানুষ না হওয়ার পাপ। তার জন্যে ঈশ্বর বা সমুদ্র শাস্তি দিতে সৈন্য পাঠায়নি। এ নিতান্ত এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভয়ঙ্কর প্রলয়কাণ্ড।

এই সবে (১৯৮৪ সালে) ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনা গিয়েছে। ১৯৯৩ সালে ঘটে গিয়েছে লাতুরের ভূকম্পন। ১৯৯৯ সালে সাইক্লোনে বিধ্বস্ত হয়েছে উড়িষ্যা। ২০০১ সালের ২৬শে জানুয়ারী কচ্ছে ভূকম্প হয়ে গেল। প্রায় চার বছর পরে এল নতুন বিপর্যয়।

২। সুনামি কি?

আগেই বলেছি, সে এক ভয়ঙ্কর সমুদ্র-লহরী। উত্তাল জলোচ্ছ্বাস বা সমুদ্র দানবের জেগে ওঠা। গল্পকথার ড্রাগনের থেকেও ভয়ঙ্কর। পুরাণ বলেছিল — সমুদ্র মন্থনের কথা। দেব ও দানবের সমুদ্র-মন্থন। সে মন্থনে উঠেছিল হলাহল এবং অমৃতভাণ্ড। সুনামিও যেন সেই সমুদ্র মন্থনের ফল। তবে দেব-দানবের নয়, প্রকৃতির। আর তা থেকে উঠে আসে শুধু হলাহল।

প্রধানত ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্ভব। সাগরের জল ঠেলে অগভীর সমুদ্র-উপকূলে তালগাছের মতো উত্তাল তরঙ্গের আছড়ে পড়া। ঘরবাড়ি পথঘাট ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে। মানুষ, পশুপ্রাণী এক লহমায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তলিয়ে যায় মহাসমুদ্রে। উথালপাথাল ভাঙাগড়ার সে এক মরণ-খেলা।

মাঝসাগরে তেমন কিছু ঘটে না। যত প্রলয় ঘটে সমুদ্র উপকূলে। কিংবা দ্বীপভূমিতে। জলপ্রবাহ যত কূলের কাছে এগিয়ে আসে, ততই তার বেগ কমে যায় আর ঢেউ উঁচু হতে থাকে। ১০ মিটার পর্যন্ত উঁচু জলের দেয়াল হয়ে আছড়ে পড়ে। যাদের সমুদ্র স্নানের অভিজ্ঞতা আছে, তারাই জানে সমুদ্রে সামান্য কয়েক হাত ঢেউ কী প্রবল বিক্রমে ঠেলে ফেলে দেয় জলে-নামা অবগাহনকারীদের। আর এ হল কয়েকতলা বাড়ির মতো উঁচু ঢেউ বা তরঙ্গ-প্রাচীর। এর ধাক্কায় সবকিছুই পরাস্ত হয়, ভেসে যায় খোলামকুচির মতো।

জাপানী শব্দ 'ৎসুনামি' বা 'সুনামি'-র অর্থ — বন্দর লহরী। কেননা 'ৎসু' মানে বন্দর এবং 'নামি' মানে লহরী বা ঢেউ। সমুদ্র-বন্দর কাঁপানো এই তরঙ্গ-দোলা বলে নামটা এরকম হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

জলসমুদ্রে এমনিতেই তরঙ্গ-দোলা থাকে। সূর্য-চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণে জোয়ার-ভাঁটার সময় সাগরে-মহাসাগরে যে ঢেউ হয় তার নাম টাইডাল ওয়েভ। এ তা থেকে আলাদা।

সুনামির সমুদ্র-তরঙ্গ উৎপত্তির অন্যতম কারণ ভূকম্প। তবে শুধু ভূকম্প নয়। কারণ হতে পারে বড়ো রকমের ভূমি-ধ্বস, অগ্ন্যুৎপাত, বিস্ফোরণ কিংবা বড়ো উল্কাপিণ্ডের আঘাত। তখন সমুদ্রজলে উপরনিচে যে আলোড়ন হয়, তাতে তরঙ্গশ্রেনি জন্মাতে পারে। এক গামলা জলে ভারি একটা পেপার-ওয়েট ফেলে দেখুন কি হয়! দেখবেন, গামলার প্রান্তদেশ থেকে জল ছিটকে বাইরে ছলকে পড়ছে। সাগর-মহাসাগর ঐ রকমের বড়ো জলাধার। তার মধ্যে কিছু পড়লে বা অমনধারা আলোড়ন হলে, জলতরঙ্গ চারদিকে তীব্রগতিতে দৌড়তে থাকবে। ধাক্কা দেবে জলাধারের প্রান্তে থাকা উপকূলে।

প্রথমে দেখা যায়, উপকূল থেকে সমুদ্রের জল আচমকা দূরে সরে যাচ্ছে। তারপর ফণা তুলে তালগাছের মতো উচ্চতায় বিশাল জল-প্রাচীর বানিয়ে ধেয়ে আসছে উপকূলে। একবার নয় বারবার। পরপর কয়েকবার এই জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ে। গভীর সমুদ্রে তরঙ্গমালা বেশি উঁচু হবে না। কিন্তু ধেয়ে যাবে বিপুল বেগে। সেই তরঙ্গমালা যত গভীর সমুদ্র থেকে অগভীর সমুদ্রে এগোবে, ততই তার গতিবেগ কমে ঢেউ উঁচুতে উঠবে। তারপর বিশাল জলপ্রাচীর হয়ে আছড়ে পড়বে উপকূলে।

একথা আট বছরের টিলি জানত। ভূগোলে সে পড়েছিল এবং ভালো করে বুঝেছিল। আর জানত আদিম উপজাতির দল। তারা সকলে বেঁচে গিয়েছিল।

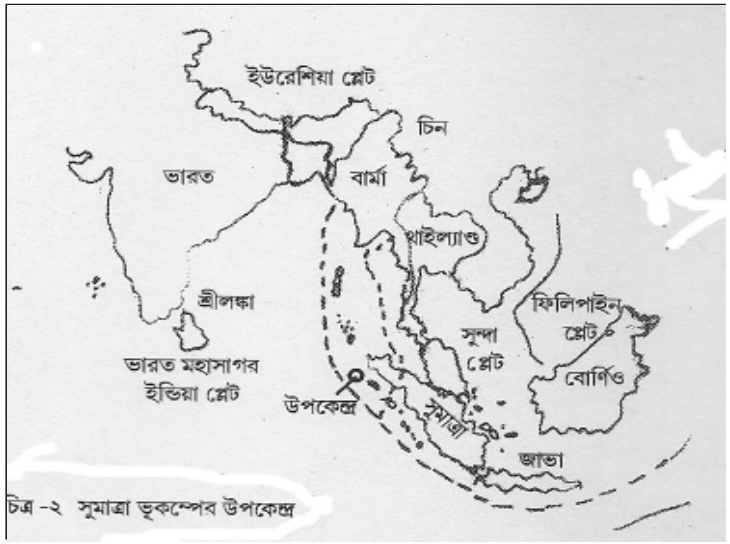

চিত্র -২। সুমাত্রা ভূকম্পের উপকেন্দ্র

৩। কালান্তক রোববার ২৬শে ডিসেম্বর

সেই কালান্তক রোববার ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৪ সালে ঠিক কি ঘটেছিল?

সবে মহামানব যীশুখৃষ্টের জন্মদিন পালিত হয়েছে। সপ্তাহের শেষে শনিবার পড়েছে বড়োদিন। একে বড়োদিনের আনন্দ-উৎসব, তায় পরদিন রোববার। কদিন পরেই তো বর্ষশেষের উৎসব। ইংরেজী নববর্ষ উদযাপন নিয়ে উন্মাদনা সর্বত্র। এ সময়টা ছুটি নিয়ে লোকে বেড়াতে যায়। সমুদ্র সৈকতে। সমুদ্রস্নান তো আছেই। আছে রৌদ্রস্নান, স্কি, সার্ফিং। বিনোদনের আরো নানা ব্যবস্থা। 'সাগরজলে সিনান করি' উপল উপকূলে, নন্দিনীরা বসে থাকেন 'সজল এলোচুলে'।

সমুদ্রের সঙ্গে মিতালী পাতার লোভে পর্যটক ছুটেছে ভারতের তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরী, কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশে। উড়ে গিয়েছে বা ভেসে গিয়েছে সাগরদ্বীপ আন্দামান-নিকোবরে। বিদেশী পর্যটকের দল বেশি করে ভিড় জমিয়েছে শ্রীলঙ্কায়, থাইল্যাণ্ডে, মালয়েশিয়ায় এবং ইন্দোনেশিয়ার জাভা-সুমাত্রায়।

সমুদ্র-সন্তান মৎস্যজীবীরা অবশ্য প্রতিদিনের মতো সমুদ্রে ভেসে যায় জীবিকার সন্ধানে। তারা সমুদ্রের উপকূলে বসবাস করলেও তা বিনোদনের বসবাস নয়। রোজকার জীবনযুদ্ধের নির্ঘন্ট পালন করা তাদের। সমুদ্র ঘিরে।

কে আর জানত বছরের শেষ রবিবার হয়ে উঠবে এক কালান্তক দিন!

২৬শে ডিসেম্বর, ২০০৪ সাল। ভারতীয় সময় ৬-২৯ মিনিট। ইন্দোনেশিয়ায় সময়ের হেরফেরে হয়তো আরেকটু বেলা হয়েছে। ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে সাত বা আট।

হঠাৎ ভূকম্পন হল। তার উৎস ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমতম দ্বীপ সুমাত্রার কাছে। এই সুমাত্রার পশ্চিম প্রান্তে আচে প্রদেশ। প্রাদেশিক রাজধানী বান্দা আচে। তার দখিণে ভারত মহাসাগরের বুকে ডাঙা থেকে ১৪০ কিমি ভিতরে উপকেন্দ্র। ৩.২৯৮ ডিগ্রি উত্তর অ'খ'াংশ ও ৯৫.৭৭৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। ব্যাঙ্কক থেকে দূরত্ব হবে ১২৬০ কিমি দখিণ-দখিণপশ্চিমে। কেন্দ্রস্থল মহাসাগরের ৪০ কিমি নিচে।

আমরা জানি ভূকম্পন মাপা হয় ১৯৩৫ সালে চার্লস রিখটার (১৯০০-১৯৮৫খৃ) দ্বারা আবিস্কৃত স্কেল ধরে। ১ থেকে ১০ পর্যন্ত এর মাত্রা — ধ্বংস-'খ'মতার উপরে নির্ভর করে ঠিক করা হয়েছে। সুমাত্রা ভূকম্পনের রিখটার স্কেলে মাত্রা ৮.৯ থেকে ৯-এর মধ্যে। ৮ মাত্রার বেশি কম্পন হলেই তা হয়ে ওঠে এক প্রবল ভূ-কম্পন। যদিও তা সচরাচর হয় না। ফলে এক প্রবল কম্পন দখিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। কাছেই মায়ানমার-থাইল্যাণ্ড-মালয়েশিয়ার উপকূল। সর্বত্র মাটি কেঁপে উঠল। বাসুকির ফণায় পৃথিবীর ভার ভয়ানক হয়ে উঠেছে? সে নড়েচড়ে বসেছে?

রিখটার স্কেল	'খ'তির মাত্রা
১-২.৫	এমনিতে বোঝা যায় না, রেকর্ড করা যায়।
৪.৫	স্থানীয় 'খ'য়'খ'তি হয়।
৬	জনবহুল এলাকায় বিধ্বংসী হতে পারে।
৭	বড়ো মাপের ভূ-কম্পন, প্রবল 'খ'য়'খ'তির সম্ভাবনা।
৮-এর বেশি	বিশাল মাপের কম্পন, অনেক বড়ো এলাকা জুড়ে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাতে পারে।

প্রায় একই সঙ্গে তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গেও সেই ভূকম্পন টের পাওয়া গেল। সময় সকাল ৬-৩৩ মিনিটে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরে ও খড়্গপুর আই-আই-টির ভূ-পদার্থবিদ্যা বিভাগের যন্ত্রে বড়ো ভূকম্পনটি এসেছে ৬-৩৪ মিনিটে। টের পাওয়া গেল দিল্লিতে। ধরা পড়ল সুদূর হনলুলুর মার্কিন সিসমোগ্রাফে। অবশ্যই জাকার্তার ভূ-কম্পন মাপার যন্ত্রেও। কম্পন একবার নয়। কয়েকবার ধরে হল। প্রথম কম্পনের পরে পরপর অন্তত ৫ বার কম্পন হল। তাদের শ'কতি' কম — ৭ রিখটারের মতো।

সুদূর পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাবে ঘরবাড়ি কেঁপে উঠেছে। থালাবাটি ঝনঝন করে শব্দ করে উঠেছে। পুকুরের জল দুলে উঠেছে। কোথাও নাকি ছলকে উঠেছে পাড়ে। কৃষ(নগরে একজন তো প্রাতকৃত্য সারতে গিয়ে জলে ডুবে মরেই গেল।

ঐ কম্পনের ফলে সমুদ্রজলে যে সৃষ্টি হতে পারে প্রলয়কালের সুনামি, সেকথা ভাবেনি কেউ। আসলে অমন একটা ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের ভারতীয়দের কোন পূর্ব-পরিচয় নেই। হ্যাঁ, যারা ভূগোল বা ভূতত্ত্ব পড়েছে, তারা হয়তো সুনামি কথার সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সাধারণ মানুষের এবং যারা বিশেষজ্ঞ নন, তাদের কোন ভাবনা-চিন্তা বা অভিজ্ঞতাই নেই এ ব্যাপারে। ওটা হয় প্রশান্ত মহাসাগর ঘিরে থাকা দেশে। এটাই চলতি ধারণা সবার! অথচ ওরকম মাত্রার প্রবল ভূ-কম্পের পরে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস স্বাভাবিক ঘটনা। কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী-পর্যবে(ক তো জানতেন যে, সুনামির সৃষ্টি হতে চলেছে। সমুদ্র দানব জেগে উঠে ধেয়ে যাচ্ছে যেদিকে, সেখানকার মানুষজনকে আচমকা নাগালে পেয়ে যাবে। খেলনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবে মহাকালের কোলে।

ভূকম্পনের ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্র থেকে উঠে এল জলোচ্ছ্বাস। প্রলয়-দানব হয়ে আছড়ে পড়ল ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায়। আচে প্রদেশে। সামান্য উত্তরে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দিকে। উত্তর-পূর্বে মায়ানমার-থাইল্যাণ্ড-সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়ার দিকে। থাইল্যাণ্ড-মালয়েশিয়ার মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে। জলস্ফীতি ভারত মহাসাগর বঙ্গোপসাগর ধরে ছুটল পশ্চিম পানে। জলের বেগ ঘন্টায় ৫০০ থেকে ৬০০ কিমি। তরঙ্গ বেশি উঁচু নয়।

অগভীর উপকূলের কাছে এসে তরঙ্গবেগ কমে যায়। বেড়ে যায় তার উচ্চতা। প্রায় ঘন্টা দুই পরে কমপখে' ২০ ফুট উঁচু হয়ে আছড়ে পড়ল ভারতের পূর্ব উপকূলে — তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরি ও অন্ধ্রপ্রদেশে। পূর্ব উপকূলে অবস্থিত না হলেও কেরলের রেহাই মিলল না। প্রায় একই সময়ে ভাসিয়ে দিল দ্বীপ-রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। 'খ'ান্ত হল না সেখানেও। আরো পশ্চিমে এগিয়ে সাড়ে তিন ঘন্টা পরে আঘাত হানল আরব সাগরের দখিণে অবস্থিত মালদ্বীপ এবং প্রায় সাত ঘন্টা পরে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল সোমালিয়ায় এবং সেখান থেকে দখিন আফ্রিকায়।

তাৎ'খ'ণিক খবর — ছয়টি দেশে মৃতের সংখ্যা ১২,৭২০ জন। তার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় — ৪৪০০, শ্রীলঙ্কায় — ৩৫০০, ভারতে — ৩৫০০, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মায়ানমারে — ৩২০ জন। বোঝাই যাচ্ছে, সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। দূরদূরান্ত থেকে খবর আসতে সময় লাগবে। বেড়ে মোট মৃতের সংখ্যা কত হতে পারে সে সম্পর্কে তখনও কোন ধারণা করা সম্ভব হচ্ছিল না। আহতের সংখ্যা এবং সম্পত্তি নাশের হিসেব তো পরের কথা।

৪। কেউ বাঁচে, কেউ বাঁচে না

সেই কালান্তক দিনটায় কে বেঁচেছিল? কারা হারিয়ে গিয়েছিল? যারা চিরবিদায় নিয়েছে সমুদ্রের করাল গ্রাসে, তারা কোন কথা বলতে আসবে না। কথা বলবে যারা বেঁচে ফিরেছে। আর যাদের স্বজন হারিয়েছে। মৃত মানুষের বেলায় কেবল সংখ্যা থাকবে। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে কেবল সংখ্যা। তার মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাই হবে বেশি।

অতীতে ল'খ'াধিক মানুষ মারা গিয়েছিল ১৯২৩ সালে টোকিও-ইয়াকোহামার ভূমিকম্পে এবং ১৯৭৬ সালে চিনের ভূমিকম্পে। সুমাত্রা-কম্পন মৃতের সংখ্যা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল? পত্রপত্রিকায় দূরদর্শনে অজস্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, টেলিভিশন টিম ও উদ্ধারকর্মীর দল দুর্গত অঞ্চলে ছুটে গিয়ে সংগ্রহ করেছেন তাদের কথা। আমরা তার কিছুটা সংকলন করছি মাত্র।

ইন্দোনেশিয়া

ভারত মহাসাগরের পূর্বদিকে এশিয়া ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপমালা। সুমাত্রা, জাভা (যবদ্বীপ), বোর্নিও এবং সেলিবিস — এই চারটি বড়ো দ্বীপ। এদের একদা বৃহত্তর সুন্দা দ্বীপপুঞ্জ বলা হত। আসলে ১৩,৭০০ দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দেশ। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন হয়েছে। সবার পশ্চিমে সুমাত্রা। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দখিনতম ইন্দিরা পয়েন্ট থেকে মাত্র ৬০ কিমি দূরত্বে।

সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর ভাগে আচে প্রদেশের গায়ে তাণ্ডব হয়েছে সবথেকে বেশি। ভূকম্পের উৎস কাছেই কিনা। ল'খ'াধিক মৃত মানুষের মধ্যে অর্ধেকই যেন আচে প্রদেশের। জলোচ্ছ্বাসে কত লোক যে ভেসে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে গিয়েছে। উপকূলের অসহায় মানুষ আচমকা সমুদ্রের প্রলয় তাণ্ডবে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে। ঘরবাড়ি গেরস্থালি সবকিছু তছনছ। কত যে মানুষ মারা গিয়েছে, আমরা তার হদিশ করে উঠতে পারছি না। সাগরজলে মৃত মানুষের পশুদের শব ভাসছে। ঢেউয়ের দোলে ফিরে আসছে সমুদ্রতটে।

ধ্বংস হয়েছে বান্দা-আচে। এবং আরেক উপসাগরীয় শহর লোকসিউমামাওয়ে। ছারখার হয়ে গিয়েছে উপকূলের গ্রামে লানকুক। লাগুয়ে গ্রামে একটিও বাড়ি নেই আস্ত। সব শ্মশান। দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু মসজিদখানা। সুমাত্রার দখিন দিকে পরপর দ্বীপ রয়েছে সিমালুর, বাঞ্জাক, নিয়াস, বাটু, মেন্তাওয়াই, পাগি, তেলাঞ্জাঙ্গ ইত্যাদি। মিউলাভো গ্রামে ২৮,০০০ মানুষ মৃত। বান্দা-আচে থেকে ৬৬ কিমি দূরের লোহ-ক্রুয়েত গ্রাম বিধ্বস্ত হয়েছে। রাজধানীর দখিনে মেদানে, আসে-বেসারে ও অন্যান্য জায়গায় ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে।

বান্দা আচে থেকে ফয়জল জানাচ্ছে — নারকোল গাছের মতো উঁচু হয়ে ঢেউ ভেঙে পড়েছে এসে, শহরে জল ঢুকেছে হুহু করে। দেখতে দেখতে সিটি সেন্টার তলিয়ে গেল ৩ মিটার জলের নিচে। তখন সকলে প্রাণ হাতে করে ছুটছে। এর মধ্যে কত যে ভেসে গেল তলিয়ে গেল কে জানে!

মার কোল থেকে সন্তান ভেসে গিয়েছে প্রবল জলের তোড়ে। বাবা-মা হারিয়ে শিকড়-ছাড়া গৃহহীন হয়ে পড়েছে বুঝি একটা গোটা প্রজন্ম। তাদের পরিচয় দাঁড়াল সুনামি-প্রজন্ম। যেমন, দশ বছরের রমেশ কুমার বাবা-মা হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ল। পরিবারের সকলকে

হারিয়ে কিশোরী সীতা ও দুই ভাই বেঁচে রইল। বীভৎস তাণ্ডবের খবর বেশি করে আমরা পাচ্ছি বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকে।

একদা আচের হোঙ্গা শহরে ১০,০০০ মানুষ বাস করত। সেখানে এক গলফ কোর্স ছিল। মহম্মদ কিকি কাজ করত সেখানে। বিশাল ঢেউ ধেয়ে আসছে দেখে সে বোনকে বাঁচাতে ছুটল। তাকে বাঁচানো গেল না। করাল গ্রাসে ভেসে গেল সে। কিকিও প্রথম ধাক্কায় সমুদ্রের তিন মাইল ভিতরে চলে গিয়েছিল। ভাসতে ভাসতে পরে ফিরে আসতে পেরেছিল।

আচে প্রদেশের রিজাল সাহপুত্র মসজিদ সাফাই করছিল তখন। সমুদ্র-দানব এসে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। রিজালকেও। ডুবে যেতে যেতে রিজাল নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল ভাসমান নারকেল গাছ। সেটাই আঁকড়ে ধরে রইল। একদিন দুদিন নয়, টানা আটদিন ধরে। বৃষ্টির জল আর ভেসে-যাওয়া নারকেল খেয়ে বেঁচেছিল সে। উদ্ধার দুর্যোগের এক সপ্তাহ পরে।

সুমাত্রার উত্তরে পুলাউ-ওয়ে দ্বীপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১০জন পর্যটককে। তারা ছিল সাবাং শহরে।

সুমাত্রার পশ্চিমে কালাং শহরের একজন দুর্গত মানুষও বেঁচে গিয়েছিল। ছ'দিন ধরে হেঁটে হেঁটে সে পৌঁছেছে বান্দা-আচে নগরে। প্রলয় দানবের হাত থেকে বেঁচে উঠে ত্রাণের আশায়।

বান্দা-আচের এক সমুদ্রতীরে পর্তুগিজ ফুটবল দলের জার্সি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মার্তুনিস নামের সাত বছরের ছেলেটি। সমুদ্র তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, যেমন করে টেনে নিয়েছিল তার পরিবারের অন্যদের। তবে মা আর দুই ভাইবোনকে না ফিরিয়ে দিলেও ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। সে বেঁচে গিয়েছে। একুশদিন ধরে সমুদ্রতটে পড়েছিল কাদাজল আর শুকনো নুডলস খেয়ে। এক বৃটিশ টেলিভিশন দল তাকে উদ্ধার করে। তার দাদু আর বাবা জীবিত।

প্রলয়কালে মৃত্যুই সহজ ও স্বাভাবিক যেন। জীবন ফিরে পাওয়াই আশ্চর্যজনক। এক রকমের অপ্রতুল ঘটনা।

থাইল্যাণ্ড

ইন্দোনেশিয়ার উত্তরে থাইল্যাণ্ড। এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে দখিন-পূর্ব দিকে মালয় উপদ্বীপ নেমে গিয়েছে সমুদ্রের ভিতরে। পশ্চিমে মালাক্কা প্রণালী ধরে ভেসে গেলে দখিনতম প্রান্তে পড়ছে মালাক্কা-সিঙ্গাপুর। মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে আন্দামান সাগরে অজস্র দ্বীপভূমি রয়েছে থাইল্যাণ্ড ও মালয়েশিয়ার দখলে। যেমন — ফিফি, রানোং, ত্র(াবি, ফুকেট, টাকুয়াফাংগা, কান-থাং, পেনাং ইত্যাদি। সুন্দর সমুদ্র সৈকত ঘিরে থাকা সেই সব দ্বীপভূমিতে দেশবিদেশ থেকে ভ্রমণকারীর ঢল নামে সারা বছর।

থাইল্যাণ্ডের ফুকেট দ্বীপে পাটং সমুদ্র-সৈকতে যখন সুনামির বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়েছে, তখন হোটেলের ঘরে ছিল ফুকেট দ্বীপে বেড়াতে-আসা সুইডেনের কার্লসন। তাকিয়ে

দেখলেন সৈকত লণ্ডভণ্ড। জল ঢুকছে প্রবল বেগে। হোটেলের পিলার জাপটে ধরে তাকে বাঁচার চেষ্টা করতে হচ্ছে।

স্কটল্যাণ্ডের স্কুল টিচার জন ক্রস্টনও বেড়াতে এসেছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন সমুদ্রের জল দ্রুত সরে যাচ্ছে। নৌকো ডুবে যাচ্ছে বালিতে। মাছেরা ভেজা ডাঙায় ছটফট করছে। বুঝতে পারেন এসব সুনামির পূর্ব-ল'খ'ণ। বউ আর মেয়েকে বগলদাবা করে নিয়ে ঝটপট বেরিয়ে পড়েন পথে। উঠে পড়েন চলতি এক বাসে। বাসে উঠেই সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেন সামনে ভয়ানক বিপদের কথা। এক ডাক্ত(ার-যাত্রী ক্রস্টনের কথা বুঝতে পারেন। তাদের বিস্তর চেঁচামেচিতে ভরসা রেখে চালক বাস ঘুরিয়ে নিয়ে পালাতে তৎপর হয়। তারপরেই ঢেউ আছড়ে পড়ে রাস্তায়। বাসও তত(ণে ছুটতে থাকে। কপালজোরে বেঁচে যান ক্রস্টন পরিবার এবং একবাস মানুষ। ক্রস্টনের ভূতত্ত্ব নিয়ে সামান্য পড়াশোনা থাকার জন্যে র'খ'া পেল সবাই।

দখিনী এই ফ্যাং-গ্যাং প্রদেশের ফুকেট দ্বীপের উপর আন্দামান সমুদ্র কিনারে সুবিখ্যাত খাও-লাক সৈকত। একটি বুদ্ধ মন্দির রয়েছে শহরের কেন্দ্রস্থলে। ওয়াত-লাম-কায়েন। সুন্দর সৈকতে সুইডিশ মেয়ে আইমে ইয়দকায়েউ থাই স্বামী নিয়ে ঘর বেঁধেছিল। কটেজ বানিয়ে বসবাস করত। বিদেশীরা এসে আশ্রয় নিত। সেই দুর্যোগের দিনে সবকিছু ফেলে জীবন বাঁচাতে পালাতে হয়েছে। সমুদ্র কেড়ে নিয়েছে তাদের সংসার। তারা শুধু প্রাণে বেঁচে গিয়েছে।

থাইল্যাণ্ডের রাজার নাতি একুশ বছরের ভূমি জেনসেন তখন সমুদ্রজলে জেট-স্কি করছিল। নিস্তার মিলল না তার। ফ্যাংগ্যাং রাজ্যের খাও-লাকে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল।

ফুকেটে দুজন ভারতীয় — সুমনম শ্রীধর ও সঙ্গীতা শাহ, মারা গিয়েছে। তারা পর্যটকদের স্বর্গরাজ্যে বেড়াতে এসেছিল।

খাও-লাক রিসর্ট বিধ্বস্ত হয়েছে। আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে গিয়েছে আঠারো মাসের এক শিশু। জলের তোড়ে সে উঠে পড়েছিল ভাসমান তোষকের উপর। উদ্ধার করেছে ভারতীয়রা। তার বাবা-মা দুজনেই মৃত। পাঁচ বছরের এক ভাই কেবল বেঁচে গিয়েছে।

সুন্দরী খাও-লাকের সফিটেল ম্যাজিক লেগুন রিসর্ট ও স্পা-তে সেদিন ছিল ঠাসা ভিড়। ফলে এখানে অন্তত দুশ' পর্যটক মারা গিয়েছেন। সংখ্যাটা তিনশ' হলেও হতে পারে। ছ'বছরের জো শিউ সুইমিং পুলে খেলা করছিল। জলস্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে বসিয়ে দিল সোফার উপরে। তার বাবা-মা ও দুই দাদা মৃত। বেঁচে গিয়েছে জো শিউ। মাসির কাছে সিঙ্গাপুর হল তার নতুন আশ্রয়।

দেশ ছেড়ে প্রবীণ হাইঞ্জ রাডেইলি স্ত্রী মারিয়ানকে নিয়ে এসে খাও-লাকে বসবাস করছিল বছর দশেক ধরে। সকালবেলা বাইসাইকেল সাফ করছিল। বাগানে জল দিচ্ছিল মারিয়ান। এমন সময়ে এল তুফান। পিছন দিকে উঁচু জায়গায় ছুটতে শু(করে দুজনে। হাত ধরে। প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কায় হাত ছাড়িয়ে ভেসে গেল মারিয়ান। তিনদিন পরে তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল।

ফুকেট দ্বীপে তখন শত শত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। ভেসে গিয়েছে কয়েক হাজার মানুষ।

ফিফি দ্বীপ থাইল্যাণ্ডের নাম-করা পর্যটন কেন্দ্র। দ্য বিচ নামের হলিউডি ছবির সুটিং করার জন্যে বিখ্যাত হয়েছে দ্রুত। জলোচ্ছ্বাস চুরমার করে দিয়েছে দা(ণ সুন্দর সৈকতটিকে। বেড়াতে আসা পর্যটকগণ পাঁচতারা হোটেলের ছাদে উঠে জীবন বাঁচিয়েছে।

বিখ্যাত এমারেল গুহা থেকে নিখোঁজ সত্তর জন। পর্তুগিজ রিকার্ডো কাভালহোর আট মাসের কন্যা মাফালডা ভেসে গিয়েছে মায়ের কোল থেকে। তার আর চিহ্(খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কেট স্যালটার টোকিওতে ইংরেজির শি(কা। থাইল্যাণ্ডে বেড়াতে বেরিয়েছে। বড়োদিনে ঘুরে বেড়িয়েছে কোহ-লান্টা থেকে কোহ-ফিফির কাছে কোহ-জুম দ্বীপ পর্যন্ত। পরদিন বাবাকে ই-মেলে খবর পাঠাচ্ছে — থাইল্যাণ্ডে রয়েছি। ভূমিকম্প হয়েছে। শুনছি এখানে ৩০০০ লোক মারা গিয়েছে। জ্বালানি তেল নেই, লঞ্চ নেই। আটকে রয়েছি। সমুদ্রের ধারে উঁচু এক হোটেলে ছিলাম। ভাবছিলাম সমুদ্রের আরো কাছে যাব সুন্দর একটা বাড়িতে। ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলাম বসে। সমুদ্র থেকে পনেরো গজ দূরে। হঠাৎ দেখি জল নেমে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি করে। বড্ড তাড়াতাড়ি করে। তারপরেই দিগন্তে দেখছি সাদা ঢেউ। স্থানীয় লোকজন থাই ভাষায় চেঁচামেচি করছে। সবাই দৌড়চ্ছে উঁচু জায়গায়। আমরাও দৌড়লাম যা হাতের কাছে পেয়েছি তা নিয়ে। প্রথম ঢেউ আসার পরে বাকি কিছু জিনিস আনতে গিয়েছিলাম। অমনি আবার ঢেউ তেড়ে এল। দৌড়ে পালালাম। ভেবো না। ঠিক আছি।

ক্রাবি দ্বীপের হ্যাট-রাই-লে সৈকতে সুইডেন থেকে এসেছিল কারিন স্ভেয়ার্ড। সুনামির ঢেউ যখন ছুটে আসছে উপকূলে আর সকলে প্রাণভয়ে সমুদ্র থেকে পালাচ্ছে, সে তখন তার তিন ছেলেমেয়ে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিল সমুদ্রের দিকে। নিজের জীবন বিপন্ন করে। সকলে চীৎকার করে বলছে — যেও না। নিষেধ না শুনে কারিন এগিয়ে গেল। সামনে আগুয়ান তরঙ্গ -দোলায় পড়ে গিয়েছিল। ভেসে গিয়েও একে একে পায়ের নিচে মাটি পেল সকলে। উঠে দাঁড়াতে পারল। শেষ পর্যন্ত তার দুই ছেলে বাংলোয় উঠে যেতে পারল। কারিনের স্বামী সুইমিং পুলে গিয়ে পড়েছিল। ভাসতে ভাসতে কারিন গাছের গুড়ি নাগালে পেল। জাপটে রইল সেটা প্রাণপনে। ধেয়ে এল ঢেউ আবার। জল উঠে গেল প্রায় মাথার কাছে। ভাসছে ডেকচেয়ার অন্যান্য জিনিসপত্র। ঘন্টাখানেক পরে জল নেমে গেল। দেখা গেল তারা সকলেই বেঁচে রয়েছে।

আহা বাঁচার কী আনন্দ!

মাওখাও বিচে কয়েকশ পর্যটক ছিল সেদিন। আট বছরের টিলি। মিস্টার কির্নির ভূগোল ক্লাসে পড়া বিদ্যা কাজে লাগিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে পর্যটকদের। সমুদ্রের চেহারা দেখে তার সুনামি বলে মনে হয়েছিল। সে জেনেছিল তাণ্ডব থেকে র(ার জন্যে মাত্র দশ মিনিট সময় মেলে। সেকথা মাকে এবং অন্য সবাইকে জানিয়ে দিল।

দাং সালাংগাম ও তার বৌ কুলদা আটটি হাতি নিয়ে বসবাস করে খাও-লাকে। জীবিকার জন্যে তারা ভ্রমণকারীদের হাতির পিঠে চড়ায়। সেদিন ভূ-কম্পন টের পেয়ে অবোধ হাতিরা কেমন যেন ক(ণ স্বরে ডাকছিল। ঠিক ডাকও নয়, মনে হচ্ছে কাঁদছিল। একটু পরে তাদের কান্না থেমে গেল। আর কিছু(ণের মধ্যে তারা ভয়ানক ছটফট করতে শু(করল। এক সময় মাহুতকে আর গ্রাহ্য না করে উঁচু ডাঙায় ছুটে লাগাল। অন্য হাতিরাও শেকল ভেঙে দৌড়ে পালাল। সেই সঙ্গে পিঠে করে নিয়ে গেল কয়েকজনকে। তারা নিজেরা তো র(া পেলই, সেই সঙ্গে বাঁচিয়ে দিল কয়েকজন মানুষ।

থাইল্যাণ্ডের ফ্রা-থঙে বেড়াতে এসেছিল স্কটল্যাণ্ডের অ্যানড্রু কিথ। জলের উচ্ছ্বাসে ভাসতে ভাসতে যখন জীবনমরণের সঙ্গে লড়াই চলছে, তখন তাকে বাঁচার তাড়নায় জাপটে ধরে এক নারী। তার জঠরে বেড়ে উঠছিল আরেকটি প্রাণ। জল বাড়ছে যত, স্রোতের টানও তত বাড়ছে। কিথ আপন প্রাণ বাঁচাতে সেই অন্তঃসত্ত্বা মহিলার হাত দুখানি ছাড়িয়ে দিল জোর করে। বাঁচল সে। পরে সেই মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেল। সেই থেকে আত্মগ্-ানিতে ভুগছে কিথ — আরো দুটি প্রাণ না বাঁচাতে পারার জন্যে।

মৎস্যজীবী এক গ্রামপ্রধান ৬৫ বছরের সারমাও কাথালে বলছিল — বড়োদের কাছে শুনেছি, সমুদ্র যখন পিছনে চলে যায়, তখন বুঝতে হবে প্রলয় দানব হয়ে সে এখুনি ফিরে আসবে। তাই সে চীৎকার করে গ্রামের মানুষ জড়ো করে উঁচু ডাঙায় নিয়ে তুলেছিল সকলকে। ১৮১ জন মানুষের প্রাণর'খ'া করল বৃদ্ধ গ্রামপ্রধান। এর নাম পরম্পরা। অবজ্ঞা করা যায় না তাকে।

মালয়েশিয়া

১৯৬৩ সালে মালয় উপদ্বীপ, বোর্নিও দ্বীপের উত্তরাংশের সারওয়াক এবং সাবা নিয়ে গঠিত হয়েছে মালয়েশিয়া। সুনামির ধাক্কা লেগেছে মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে। পেনাং দ্বীপের সৈকতে পিকনিক করতে গিয়েছিল পর্যটকের দল। অনেকের খোঁজ মেলেনি। লাংকাসি দ্বীপের উপকূলে মোটর গাড়ির মাথায় চড়েছে জলযান বোট। সবই একত্রে ভেঙেচুড়ে তালগোল পাকিয়েছে। মহাপ্রলয়ের পরে সামুদ্রিক প্রাণীর মৃতদেহে ভেসে উঠেছিল সৈকতে। র'খ'া পায়নি জলের জীবও।

মায়ামি বিচের তটভূমিতে রেস্তোরা সুপিয়ার। এবং তার বসবাস। সবে খুলে বসেছে দোকান। বিকট শব্দ করে ঢেউ এসে ছিটকে দিল তাকে। সামনে খুঁটি পেয়ে জাপটে ধরল। তার বারো বছরের মেয়ে চোখের সামনে ভেসে গেল। মাদুরে শোয়ানো ছিল কুড়ি দিনের সদ্যোজাতা কন্যা। সেও ভেসে উঠল শায়িত অবস্থায়। এবং বেঁচে গেল। অন্য মেয়েকেও পরে পেয়েছে। পায়নি তার বউটিকে। অনেকের মতো সেও নিখোঁজ।

পেনাং দ্বীপেই এগারো বছরের মহম্মদ ফিকরি রহিম খেলছিল দিদির সঙ্গে। মা রহিবা ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত ছিল। সেই দিদি আজ আর নেই। মা বেঁচেছে ঘরের খুঁটি আঁকড়ে ধরে। মেয়ের হাতে ধরার কিছু ছিল না। ধরার মতো জোরও ছিল না। রহিম বেঁচেছে। হাসপাতালে

শুয়ে আছে আতঙ্কে নীল হয়ে। ঘুমের মধ্যে ডুকরে কেঁদে উঠছে না না বলে। জিজ্ঞেস করলে বলে — বিকট শব্দ হল একটা, তারপর ঢেউ ছুটে এল, উঁচু তালগাছের মতো ঢেউ।

এটুকু বলেই চুপ হয়ে যায় সে।

ভারত

ভূকম্পের উপকেন্দ্র থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ড অনেকটা দূরেই ছিল। অন্তত ১৫ ডিগ্রি পূর্বদ্রাঘিমায়। মানে প্রায় দেড় থেকে দু হাজার কিলোমিটার দূরে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ শুধু অত্যন্ত কাছে। গড়পড়তা দূরত্ব ৩৫০ নটিকাল মাইল। ইন্দিরা পয়েন্ট থেকে সুমাত্রা মাত্র ৬০ কিমি দূরে। ফলে ভারতের সবথেকে বড়ো মাত্রার 'খ'তি হয়েছে এই দ্বীপাবলিতে।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে ৫৭২টি দ্বীপ। তার মধ্যে ১৩০টি দ্বীপে মানুষ পৌঁছলেও বসতি গড়ে উঠেছে মাত্র ৩৬টি দ্বীপে। উত্তরে থেকে দখিনে বিস্তৃত রয়েছে উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান ও দখিন আন্দামান দ্বীপমালা। রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার দখিন আন্দামানের পূর্বতটে। তারপর লিটল আন্দামান। অশান্ত দশ ডিগ্রি চ্যানেল পার করে শু(নিকোবর দ্বীপমালা — কার-নিকোবর, কামোর্তা, কাদুল, লিটল নিকোবর ও গ্রেট নিকোবর। এ ছাড়া ছোট ছোট আরো অনেক দ্বীপ রয়েছে। তার মধ্যে ৩০টি দ্বীপ ভীষণভাবে 'খ'তিগ্রস্ত হয়েছে। দ্বীপ সমূহে জারোয়া, ওঙ্গি, আন্দামানি, নিকোবরি, শোম্পেন, সেন্টিনেলি ইত্যাদি আদিবাসী উপজাতি ছাড়া অনেক বাঙালি উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হয়েছিল। বাঙালিরা মোটামুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পরে দখিন ভারতীয় তামিল তেলেগু ভাষাভাষি মানুষও বসবাস করতে থাকে। সামরিক দিক থেকে এই দ্বীপাবলি বিশেষভাবে গু(ত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার। নৌবাহিনীর গু(ত্বপূর্ণ ঘাঁটিও। বায়ুসেনার ঘাঁটি কার-নিকোবরে।

প্রাথমিক কম্পনের পরে কয়েকবার ভূকম্পন হচ্ছিল থেকে থেকে। বাড়িঘর দুলছিল নাকি পেণ্ডুলামের মতো। রাস্তাঘাটে চিড় ধরেছে। ১১,৫০০ ফুট দীর্ঘ পোর্টব্লেয়ার বিমানবন্দরের রানওয়েতে ফাটল ধরেছে প্রায় ৫৫০০ ফুট। এয়ার-বাস নামার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কোমরজলে ডুবে গিয়েছে মেরিনা পার্কের রামকৃষ(মিশনের বাড়ি। গোটা একতলাই জলে ডুবে। সমুদ্র-জেটি খেলনার মতো ভেঙে গিয়েছে। নোনা জল ঢুকে পড়েছে শহরে। এমন কি জাহাজও ডাঙায় চড়ে বসেছে। সেলুলার জেলের পাঁচিল ও ঘরের দেয়াল ভেঙে গিয়েছে। কারার সেই লৌহকপাট এতদিনে যেন সত্যি ভগ্ন হল প্রকৃতির খেয়ালে।

বিপন্ন পর্যটকের দল। বিনোদন শিকেয় উঠল। প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে ব্যাকুল তখন। রোববারেই তিনটি বিমানে ৩৫৪ জন যাত্রীকে তুলে আনা হল। জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, খাবার নেই, আশ্রয় নেই। তারপর আরো বিমানে সরিয়ে আনা হল বিপন্ন মানুষজনকে।

আন্দামান থেকে যে এম-ভি হর্ষবর্ধন নামের জাহাজটি রওনা হয়েছিল বড়োদিনের দিন। তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। জাহাজ তখন সমুদ্রে ভাসছিল নিশ্চিন্তভাবে। স্যাণ্ডহেড

থেকে ৬০ কিমি দূরে। টের পায়নি যাত্রীরা যে কী ভয়ঙ্কর দুর্বিপাক থেকে তারা মুক্তি(পেয়েছে। জাহাজটি যথাসময়ে এসে পৌঁছেছিল কোলকাতা।

সেদিন সকাল সাতটায় এম-ভি আকবরের হাড্ডো বন্দর ছাড়ার কথা। ১,৫৬০ জন যাত্রী নিয়ে। ক্যাপ্টেন বেদি এস-ও-এস বার্তা পেলেন। তৎপর হয়ে পৌনে সাতটায় ভেসে পড়লেন অকূল সমুদ্রে। গভীর সমুদ্র এবং একখানি এস-ও-এস বাঁচাল দেড় হাজার মানুষকে। ।

প্রাথমিকভাবে নিকোবর ও ক্যাম্পবেল-বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। খবর ছিল না নানকৌরি, তারাসা, পিলোমিলো, কুণ্ডুল দ্বীপের। কার নিকোবরে ২৯,০০০ ও নিকটবর্তী নানকৌরিতে ১৮,০০০ লোকের বাস।

কার নিকোবরের কারনিক এয়ার বেসে চারশ' সেনা ছিল। তার মধ্যে ১১৭ সেনা মৃত। একটিও পাকা বাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। দমকল ব্রিগেড ভেসে গিয়েছে। অফিসার্স মেস সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এটিসি টাওয়ার ভেঙে পড়েছে। বায়ুসেনার কমাণ্ডার বন্দোপাধ্যায় যখন সেনাপ্রধান কৃষ(স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তখন তার পরনে ছিল কেবল গেঞ্জি, পাজামা আর চপ্পল।

মালাক্কায় হাজার নিকোবরি বাস করত। তাদের মধ্যে কতজন বেঁচেছে কে জানে! ইস্ট বে কাচাল বোধ হয় জনশূন্য হয়ে গিয়েছে। লিটল আন্দামানে চার-পাঁচ শ' জনের বসতি নিয়ে একটি দ্বীপও বুঝি নিশ্চিহ্(। খবর এল গ্রেট নিকোবরের ৪১-পয়েন্ট থেকে নিখোঁজ কটকের জীববিজ্ঞানী অম্বিকা প্রসন্ন ত্রিপাঠী। পরে অবশ্য তাঁকে জীবিত অবস্থায়ইপাওয়া গিয়েছে।

গ্রেট আন্দামানি কিশোরী নু জানে — মাটি কাঁপলে সারে (সাগর) আছড়ে পড়বে। বাপ-দাদারা জানে সেকথা। এ আর নতুন কথা কি! তখন মাঝ সমুদ্রে রো (নৌকো) নিয়ে ভেসে পড়তে হবে। দোভাষী জুবেরা কিশোরীর উপজাতীয় ভাষায় বলা কথার মানে করে দিচ্ছিল।

ছোট্ট কিশোরী মেয়ে আলামাস। বাবা জাভেদ, মা আয়েষা আর ৪ বছরের ছোট বোন আলিয়ার সঙ্গে গিয়েছিল লিটল আন্দামানের কাছে পিলোমিলো দ্বীপে ছুটি কাটাতে। তারা তখন সমুদ্রস্নান করছিল। হঠাৎ মাটি কেঁপে উঠল। থামল আবার কেঁপে উঠল। বিকট শব্দ হল জোরে তারপর দানব সাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল। সমুদ্র কেঁড়ে নিয়েছে জাভেদ, আয়েষা আর আলিয়াকে। পোর্ট ব্লেয়ারে রয়েছে তার দাদু আমজাদ মাস্টার। এবং কারমেল স্কুলের ক্লাস সিক্সের বন্ধুরা। পিলোমিলো থেকে বোটে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরের কামোটা হাসপাতালে। সেখান থেকে চপারে করে পোর্ট ব্লেয়ার।

তারাসা দ্বীপের ওয়াচ টাওয়ার থেকে ওয়ারলেস অপারেটার রাজ্জাক আলি দেখছিলেন তখন — চেনা সমুদ্র কেমন অচেনা লাগছে। সমুদ্রটা সরে যাচ্ছে, পাক খাচ্ছে পাগলের মতো। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি দেখে সমুদ্র-প্রলয় সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মেছিল। আলি বুঝতে পারল সুনামি আসছে। টাওয়ার থেকে নামতে নামতে চেঁচাতে থাকে — পালাও পালাও। মহম্মদ নাজাম যাচ্ছিল দ্বীপের দিকে। দুজনে মিলে তখন সবাইকে পালাতে বলছিল। চীৎকার শুনে

লোকজন উঁচু জায়গায় জড়ো হল। একটু পরেই গুঁড়িয়ে যায় বন্দরের ঘরবাড়ি। অনেক জীবন বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্যে রেজ্জাকের নাম হয়ে গেল ফাদার তারাসা।

আন্দামানে জারোয়ার সংখ্যা ২৬৬/৩০০র মতো। তাদের তেমন 'খ'তির খবর নেই। লিটল আন্দামানের ঘন জঙ্গলে থাকে যে ১০০ জনের উপজাতি ওঙ্গিরা তারাও ঠিকই আছে। নিকোবরিরাও মোটামুটি ঠিক আছে বলে প্রাথমিক খবর। খবর নেই ক্যাম্পবেল বে-র কয়েক ঘর শোম্পেন উপজাতির। সংখ্যায় তারা ২০০/২৫০ হবে। তারা কেউ বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ।

তেল-আভিভের রোনা ড্যানিলি বড়দিন কাটিয়েছে সমুদ্র সৈকতে। রাতভর হুল্লোড়ের পরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাটির দুলুনিতে ঘুম ভাঙে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে সমুদ্র এগিয়ে এসে গ্রাস করতে থাকে দ্বীপভূমি। তার বাবা সোলোমো ড্যানিলি মেয়েকে খুঁজে পেয়ে আত্মহারা।

স্টেট ব্যাঙ্কের চিফ ম্যানেজার শ্রী আদক পরিবার নিয়ে আন্দামান গিয়েছিলেন। লিটল আন্দামানের পুবদিকের হ্যাট-বে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কোয়ার্টারে ছিলেন পত্নী অনুপমা, ছেলে অনির্বাণ এবং মেয়ে পৌলমীকে নিয়ে। জীবন নিয়ে বেঁচেছেন সকলেই। সাংবাদিকের কাছে বলছিলেন সেদিনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা। সকাল ৬-৩৫ মিনিটে প্রথম ঢেউখানা এল। ঘরে কালো কালো জল ঢুকে গেল। দুমিনিট পরে দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ল। ঘরে তখন ৫ ফুট জল থৈথৈ করছে। তৃতীয় ঢেউ এসে আঘাত করার পরে খাট থেকে পৌলমি পড়ে গেল জলে। ছেলে আর তিনি তাকে টেনে ধরে রেখেছেন। স্ত্রী সিলিং ধরে ঝুলছে। কোত্থেকে চারটে মৃতদেহ ভেসে এল ঘরের মধ্যে। ভয় আর ত্রাসে কান্না আর চীৎকার করছে অনুপমা। আমরাও সিলিং ধরে ঝুলছি তখন। কিছু(ণ, তবে তাও মনে হচ্ছিল অনন্তকাল। অবশেষে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে গিয়ে উঠি। গ্রামের মানুষ খিঁচুড়ি খাইয়েছিল রাতে। পরে কোস্টগার্ডের একটি জাহাজ তাদের উদ্ধার করে আনে।

যিনি বেঁচে ফিরলেন তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। যারা মারা গেলেন, তাদের ধন্যবাদের জায়গা কোথায় আছে?

আবহাওয়া দপ্তরে কর্মরত ছিলেন ওয়ারাঙ্গলের রাজেশ্বর। স্ত্রী শ্রীধরী, কন্যা মেঘনা এবং পুত্র আকাশকে নিয়ে চারজনের পরিবার। সমুদ্র গ্রাস করে নিল তিনজনকে। বাঁচল শুধু তেরো বছরের কিশোরী মেঘনা। একে কি বাঁচা বলে?

বনগাঁ থেকে পরিমল, নির্মল আর বুলু হালদার গিয়েছিল আন্দামানে ঠিকাদার সংস্থার হয়ে কাজ করতে। কার নিকোবরে তখন তারা বিমান বাহিনীর কোয়ার্টার তৈরীর কাজ করছিল। সেদিন সকালে মাটি দুলে উঠতেই সকলে দৌড়তে শু(করল। আকাশ জুড়ে তখন দৈত্যের মতো ৪০ ফুট উঁচু ঢেউ আসছে। দৌড়তে গিয়ে এক মহিলার কোল থেকে বাচ্চাটা পড়ে গেল। পরিমল তাকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড়চ্ছিল। সমুদ্রের গতির সঙ্গে পেরে উঠল না।

জলের তোড়ে পাক খেতে খেতে পরিমল হারিয়ে গেল অকূল সাগরে। নির্মলের খোঁজ নেই। বুলু জলের তলায় তলিয়ে গেলেও ঢেউয়ের দোলায় পেয়ে যায় নারকেল গাছ। সেই গাছ জাপটে বসেছিল। দেখল তখন অনেকেই এরকম গাছ সাঁপটে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করছিল। বুলু বাঁচল। বাঁচেনি পরিমল আর নির্মল।

চৌদ্দ বছরের মুরলীধর দশ দিন গাছে ঝুলে থেকে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু কার নিকোবরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিসট্রেট যোশি মারা গিয়েছেন।

বায়ুসেনার ইঞ্জিনিয়ার প্রণব দাস ও ইন্দ্রাণী দেড় বছর ধরে কার নিকোবরে রয়েছেন। সমুদ্রের ধারে কোয়ার্টার। ভূমিকম্প হতেই জেগে ওঠেন। বাইরে বেরিয়ে দেখেন বিশাল ঢেউ এগিয়ে আসছে। মোটরবাইকে স্ত্রীকে বসিয়ে উঁচু তত(ণে কাকানা বিচের দিকে ছুটে যায়। কম্পন থেমে যেতে ভাবলেন — বুঝি সব মিটে গিয়েছে। তত(ণে দুপাশ থেকে সাপটে ধরেছে প্রবল ঢেউ। বাইক ঘুরিয়ে বায়ুসেনার মাঠের দিকে ছুট লাগায়। গেট বন্ধ দেখে বাইক ফেলে স্ত্রীকে কাঁধে তুলে নিলেন। গেট পার হতে চেষ্টা করলেন। তত(ণে ঢেউ এসে ধরে ফেলেছে তাদের। ভাসিয়ে নিয়ে গেল দুজনকে। পাক খেতে খেতে তলিয়ে যায় তারা। নাগালে পেয়ে গেলেন গাছের গুঁড়ি। আঁকড়ে ধরে দুজনে। পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে তখন মৃত মানুষের দল। তারা সংজ্ঞা হারাল। জ্ঞান ফিরলে দেখেন নারকোল বনে পড়ে আছে তারা। এবং বেঁচে আছেন।

আই-এফ-এ কলোনিতে থাকত বিনোদকুমার ও বাবু। তুফান ধেয়ে আসছে দেখে তারা ছুটে গিয়ে ওঠে দেড়শ' মিটার উঁচু রেডার টাওয়ারে। সেদিন ওই টাওয়ার বাঁচিয়েছিল প্রায় দুশ' অমূল্য জীবন।

কার নিকোবরে শেখ রাকিবউদ্দিন এবং শ্রাবণী আহমেদ শিমূল গাছ আঁকড়ে ধরে বেঁচে গেল। মালাক্কায় বড়ো জনবসতি ছিল। লর্ড মু(গনের মন্দির ছিল। রাজীব গান্ধী পার্ক ছিল। ম্যালেরিয়া রিসার্চ সেন্টারের ডাইরেক্টর দাস তখন পোর্ট ব্লেয়ারে। নিকোবরে মালাক্কার বাড়িতে রেখে গিয়েছেন স্ত্রী লিপিকা, পুত্র বিকাশ এবং কন্যা বিনীতাকে। সমুদ্র দানব এসে ঘরবাড়ি লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েছে। ঘর নেই। স্ত্রী-কন্যার খোঁজ নেই। কেবল পুত্রকে ফিরে পেয়েছেন। ছেলে বিকাশ আঁকড়ে ধরেছিল একটি কংক্রিট পিলার। তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সমুদ্র তুফান। শেষ পর্যন্ত সে বেঁচেছে। দাস পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ছুটে এসেছেন। স্ত্রী লিপিকা ও কন্যা বিনীতাকে খুঁজছেন।

কার নিকোবরের বায়ুসেনা কোয়ার্টাসে থাকত আল্লাপুঝা জেলার এক পরিবার। ভোরে বিকট শব্দে ধুম ভেঙে যেতেই জানালার বাইরে চোখ গেল। নারকেল গাছের মাথা বরাবর ঢেউ আসছে ধেয়ে। তা দেখে দুই সন্তান ও বৃদ্ধা মা লীলামা-কে নিয়ে রেডার টাওয়ারে চড়ে বসল। নায়েক বিনোদ স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে স্কুটারে চড়ে ছুটতে শু(করল। শেষ পর্যন্ত পালাতে পেরেছিল।

ফটোগ্রাফার প্রমোদ নাগরকর ব্যালেশিয়া সাউথ বে গিয়েছিল বেড়াতে দুই বন্ধুর সঙ্গে। অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা কাছিমদের ডিম পাড়ার ছবি তুলবে বলে। তাদের কারো খোঁজ মেলেনি।

ক্যাম্পবেল বে-র উপকণ্ঠে ইন্দিরা পয়েন্ট। ফেরিওয়ালা আনবু বড়োদিনের দোকান সাজিয়ে ফি বছর ভেসে বেড়ায় নিকোবরের দ্বীপে দ্বীপে। সেদিন সে নোঙর করেছিল ক্যাম্পবেল বে জলসমুদ্রে । সকালে বাজারে দোকান সাজাচ্ছিল। হঠাৎ শু(হল দুলুনি। সাড়ে তিন মিনিট ধরে। একটু পরে ২০ ফুট উঁচু ঢেউ ছুটে এল তটভূমিতে। জেটি ভেঙে গিয়েছে। নৌকা ভেসে গিয়েছে। মছলিপট্টিতে কান্নার রোল উঠেছে। লোকজন ছুটছে প্রাণপনে উঁচু জমির খোঁজে। ক্যাম্পবেল বে-র সেনা ঘাঁটিতে ভারতীয় জওয়ান আটকে পড়েছে। পরদিন তাদের উদ্ধার করে আনে আনবু এবং জনাকয়েক জওয়ান। ইন্দিরা পয়েন্টের লাইটহাউস কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েনি।

কার নিকোবরের কাছে নানকৌরি দ্বীপে উপজাতি রানির তিনতলা বাড়ির দুতলাই জলমগ্ন। তারাসা, ত্রিঙ্কাট, চৌরা দ্বীপ জলমগ্ন। পশ্চিমের কাছাল দ্বীপটিও বিভক্ত(হয়ে পড়েছে সাগরের গ্রাসে। সেখানকার ৫,০০০ মানুষই ভেসে গিয়েছে। গ্রেট নিকোবরি জনসংখ্যা ৪৭ হলেও তাদের রাজা আছে। রাজা হলেন বাষট্টি বছরের জিরাক। রানি আছে নাম সুরমাই। রাজকুমারীও আছে নাম ট্যাঙ্গো। রাজ্যপাট ভেসে গিয়েছে। সাময়িক স্থান হয়েছে সরকারী হাসপাতালে। কংক্রিটের জঙ্গলে তাদের মন উঠছে না। বনের পাখি ফিরে যেতে চায় বনে। যার যেখানে ঘর।

উদ্ধারকারী দলের টমাস এসেছে পার্কা গ্রাম থেকে কার নিকোবরে। দুঃখ করে বলছিল — ঈশ্বর চাইছে না আমরা আর এই দ্বীপে বসবাস করি।

মূল ভূখণ্ডের মধ্যে সবথেকে বেশি 'খ'তিগ্রস্ত হয়েছে তামিলনাড়ু। চেন্নাইর সুন্দর মেরিনা বিচ শেষ হয়ে গেল তিনটি ঢেউয়ের ধাক্কায়। সকাল ৯টায়, তারপর ১১টায় এবং শেষে বেলা ১২টায় ঢেউ এসেছিল। চেন্নাই থেকে মহাবলীপুরম পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সিবিচ কার্যত বিধ্বস্ত।

সেদিন সকালে মেরিনা বিচে বেড়াতে এসেছিলেন কোলকাতার পাল পরিবার। সময় তখন ৮.৩০ মিনিট বা তার ধারেকাছে হবে। ব্যাঙ্গালোরে ছেলে পল্লব চাকরি করে। সেখান থেকে মাদ্রাজ এসেছিলেন বাবা-মার ইচ্ছে মেটাতে। সঙ্গে স্ত্রী পল্লবী ও কন্যা ছিল। সময় ৮-৩০ হবেটবে। হঠাৎ একখানি ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল তাদের উপর। জলের তোড়ে ভেসে গেলেন তারা। বৃদ্ধ প্রণববাবু কাঠের একখানি তক্তা পেয়ে সেটাই আঁকড়ে ধরলেন। পরের ঢেউ তাকে আবার তীরে এনে ফেলল। ছেলে পল্লব মায়ের হাত ধরে রেখেছিল শক্ত করে। রাখতে পারল না। প্রবল তরঙ্গে তার হাত থেকে ছুটে গেল মার হাত। ল্যাম্প পোস্ট নাগালে পেয়ে সেটা ধরে ঝুলে রইলেন পল্লব। তত'খ'ণে পল্লবী ও কন্যা ভেসে কোথায় গিয়েছে কে জানে! দুর্যোগ থামলে স্ত্রী, কন্যা ও বাবাকে খুঁজে পেলেন। মা বেলা পালের মৃতদেহ মিলল মর্গে।

মেরিনার ফিশারী রিসার্চ সেন্টারে কাজ করত বিজয়কুমার। সুনামি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ফিরেছে এক মৃতদেহ। মাদুরাই থেকে ছুটে এসে মা আন্নালখমী ছেলের শবদেহ দেখে শোকে-দুঃখে প্রাণ হারাল। বিহার থেকে বেড়াতে এসেছিল মোহাম্মদ আবুদিন। সাত জনের দল নিয়ে। তারাও মেরিনা বিচে ছিল। বেঁচে রইল মাত্র দুজন। বাকিদের খবর মিলল মর্গে।

কলাপক্কম পরমাণু কেন্দ্রের বিজ্ঞানী নিলয় কুমার সিংহ। বাড়িতে স্ত্রী কৃষ(া ছাড়া দুই মেয়ে তুলি আর বুলি। শখ করে সমুদ্র-মুখী কোয়ার্টার নিয়েছিলেন বসবাসের জন্যে। বৃদ্ধ বাবা-মা বেড়াতে গিয়েছেন। সেদিন সকালে তুলিই প্রথমে চীৎকার করে বলল — বাবা পালাও। বাইরে তখন বিশাল একখানা ঢেউ আসছে তিনতলার সমান উঁচু হয়ে। অতিকায় জলের দেয়াল একটা। প্রৌঢ় বাবার হাত ধরে পিছনের দরজা দিয়ে পালাতে চেষ্টা করলেন। কোমর জল দেখতে দেখতে গলা পর্যন্ত উঠে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল স্ত্রী-কন্যা ও মা। ইণ্ডিকা গাড়িটা দেয়ালের মাথায় তখন। সমুদ্র এসে গ্রাস করে নিল কৃষ(াকে। অন্যরা বেঁচেছে।

সেদিন আবার টাউনশিপ থেকে বাসে পিকনিক করতে গিয়েছিল জনা পঞ্চাশেক মানুষ। তারা দেরী করে পৌঁছেছিল পিকনিক স্পটে। এই দেরী করাটা তাদের বাঁচিয়ে দিল। কলাপক্কমে মারা গিয়েছিল ৬০ জন। তার মধ্যে পরমাণু বিজ্ঞানী ডাঃ সেলভারেজ আছেন।

মহাবলীপুরমের প্রাচীন মন্দির আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছে। মন্দিরের বাইরে পুরাতত্ত্ব বিভাগের বানানো দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে চলে গিয়েছে সুনামির ছোবল। আগের দিন থেকে সমুদ্রতটে নৃত্য উৎসব শু(হয়েছে সবে। শহরের ইস্ট কোস্ট রোডের খান দশেক বড়ো রিসর্ট রেহাই পায়নি। ভেঙে গিয়েছে ওলন্দাজদের তৈরী পুরোনো দুর্গটি।

সুনামির ধাক্কা বোধ করি সর্বপ্রথমে পৌঁছেছিল চেন্নাই-পন্ডিচেরির দখিনে উপকূলবর্তী মৎস্যজীবীদের গ্রাম কুড্ডালোর। চেন্নাই থেকে ১৮৩ কিমি দূরে। সকাল ৮টা নাগাদ। সমুদ্রের কিনারে জেলেদের বসতি। যেমন হয় আর কি, তেমনি ছিল কুড্ডালোরের জেলেপাড়া। কয়েকটা ঢেউ এসে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। খুব খুব খারাপ অবস্থায় বিধ্বস্ত হয়ে গেল মৎস্যজীবীদের গ্রামটি। মর্গে দেহ শনাকত করা ছাড়া যেন কোন কাজ নেই। আশেপাশে ৫০-৫৫টি গ্রাম বিধ্বস্ত। অন্তত ৬০০ লোক মারা গিয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান।

দেবানামপত্তিনাম গ্রামে ১০০ মানুষ মারা গিয়েছে। পরে ল'খ'্য করা গিয়েছিল মানুষের তুলনায় পশুপ্রাণী মারা গিয়েছে কম। অবোলা প্রাণী হলেও তারা যেন টের পেয়ে গিয়েছিল। সিঙ্গরথোপ গ্রামে আট বছরের অ(ল মোজি খেলছিল সাগরপাড়ে। আকাশ জুড়ে বিশাল ঢেউ আসছে দেখতে পেয়ে ভাই নিভেকুমারকে জাপটে ধরে পড়িমড়ি করে ছুটতে শু(করল। বেঁচে গেল শেষ অবধি।

আরেক দুর্গত এলাকা আরো দখিনের নাগাপত্তিনম। চেন্নাই থেকে দূরত্ব ৩৩৪ কিমি। ১,৩৩,০০০ লোকের বাস। সুনামির সমুদ্র ধেয়ে উঠে গিয়েছে কয়েক কিলোমিটার ভিতরে। এক কিমি দূরে ঠেলে ফেলেছে নৌকো। রেলস্টেশনে ট্রলার ভেসে এসেছে। একমাত্র এই

জেলায় মৃতের সংখ্যা প্রায় ৬০০০। নিখোঁজ আরো অনেক। সেখানে গণ-সৎকারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। মাটি খুড়লেই মৃতদেহ বেরিয়ে আসছে। দুর্যোগের দু সপ্তাহ পরেও জয়া-বাসন্তীরা সেখানে ফিরতে ভয় পাচ্ছে। মৃত মানুষের মাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠার ভয়। দু'বছরের রোজিকে যখন উদ্ধারকারী দল টেনে হিঁচড়ে বার করছে, তখনও তার মা অম(থা চীৎকার করে ডাকছে — এরকম করছে কেন, ও তো এখনো বেঁচে আছে। সন্তান হারিয়ে মা ামরুথা প্রাগলপ্রায়। আকুল কান্নায় আছাড়িপিছাড়ি করছিল সে।

নাগাপত্তিনাম থেকে মাত্র ১৫ কিমি দূরে সাগর পাড়ে খৃষ্টান অধ্যুসিত জনপদ ভেলানকান্নি। চেন্নাই থেকে ৩৫০ কিমি হবে। তামিলনাড়ুর বিখ্যাত চার্চ, দ্য শ্রাইন ব্যসিলিকা, এখানে। ১৭৬৩ সালে পর্তুগিজদের হাতে নির্মিত হয়। শোনা যায়, একদা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নিমজ্জমান নাবিকেরা মাতা মেরির কৃপায় বেঁচে ফিরে এই গীর্জা নির্মাণ করেছিল। পূজিতা হন শিশু যিশু কোলে মাতা মেরি। প্রায় সাড়ে তিনশ' বছরের প্রাচীন গীর্জা। অত্যন্ত জাগ্রত বলে মান্য। লোকে বলে - আওয়ার লেডি অফ গুড হেলথ। বিশেষ করে রোগমুক্তি(র জন্যে এর খ্যাতি। দূরদূরান্ত থেকে ভক্ত(রা এসেছেন বড়দিনের উৎসব পালন করতে। গীর্জার সামনে প্যাণ্ডেল বানিয়ে ক্রিসমাস ক্যারলে গান গেয়েছে খৃষ্টানরা। পরদিন ধেয়ে এল সমুদ্র-তুফান। গীর্জার সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়েছিল রা'খু'সে ঢেউ। কয়েক মুহূর্তের বিধ্বংসী তাণ্ডবে শত শত লোক মরে পড়ে রইল রাস্তায়। নিখোঁজ অনেক।

চেন্নাই থেকে ভেলানকান্নি এসেছে রামমূর্তি। হারিয়ে খুঁজছে সদ্যপরিণীতা সুধাকে। এদিকে ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রৌঢ় ফার্নাণ্ডেজ এসেছিল ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে। চারজনেরই খোঁজ নেই। পুনে থেকে আসা রবি বন্ধুদের খুঁজে বেরাচ্ছে। খোঁজ না পেলে বাড়ি ফেরে কী করে! বার্নাড ডিসুজা এগারো জনের পরিবার নিয়ে এসেছিল। ফিরতে পারবে মাত্র দুজন। ভেলানকান্নিতে বুলডোজার দিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরাতে হয়েছে। দিতে হয়েছে ৭০০ লোকের গণকবর। কোথাও গণদাহের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

রিজু ডেভিড বাবা-মা-কাকাদের সঙ্গে এসেছে চার্চে। সকালবেলা সাগরবেলায় বেড়াচ্ছিল। পা ভেজানোর খেলা খেলছিল জলে। গীর্জায় সকালের মাসের পরে। জল থেকে উঠে গিয়ে কেনাকাটা করতে হবে। উঠছি উঠছি করছিল সে। এমন সময় তীব্র গর্জন শোনা গেল। অমনি কালো হাতির মতো জলরাশি বিশাল পাঁচিল বানিয়ে ছুটে এল তীরের দিকে। একটা ঝাঁপটা দিয়ে চলে গেল। পর'খ'ণেই ধেয়ে এল আরো দুটো ঢেউ। তলিয়ে গেল রিজু। তার সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অন্তত ৩০০টি প্রাণ। তার মধ্যে রিজুর মা-বাবাও রয়েছে।

সকালে মালায়ালি ভাষায় প্রার্থনা হচ্ছিল বলে অনেকে তখনো চার্চে ছিল। নয়তো তাদেরও অন্তিমদশা ঘনিয়ে আসত। রেক্টর ফাদার সেভিয়ার বললেন — চীৎকার শুনে বাইরে এসে দেখি বিরাট সাগরতরঙ্গ ছুটে আসছে। প্রভুর কৃপায় এবং মাতা মেরির আশীর্বাদে চার্চ র'খ'া পেয়েছে। জল সিঁড়ি পর্যন্ত এসে ফিরে গেল। যাওয়ার পথে ফেলে গেল রাস্তার উপর অগুন্তি মৃতদেহ।

বড়ো বেদনাদায়ক সেই সব দৃশ্য!

কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ রকে আটকে পড়েছে ৫০০ জন পর্যটক। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ তখন পাগলের মতো আছড়ে পড়ছে ছোট্ট দ্বীপের উপর। সকলে ভীত। কান্নার রোল পড়ে গিয়েছে। জাহাজ নিয়ে উদ্ধারে যাওয়ার উপায় নেই। জেটি খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে। রাতে হেলিকপ্টারে তাদের উদ্ধার করা হল।

ঐ জেলার পুষ্পারানি তিন সন্তানকে জাপটে ধরে দৌড়চ্ছিল প্রাণ বাঁচাতে। পিছনে ধেয়ে আসছে জলের তোড়। জল তাদের ধরে ফেলেছে। প্রবল টানে তিনজনকে ধরে রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না তার প'খে'। এগারো বছরের মেয়ের হাত ছেড়ে দিল। ভেসে গেল সে জলের স্রোতে। একছেলে ঘাড়ের উপর নখের আঁচড় বসিয়ে মাকে কাতর স্বরে বলছিল — মা, আমাকে ছেড়ে দিও না, ভাসিয়ে দিও না।

সাহারানি ছ' ছেলেমেয়ের মধ্যে চার জনকেই হারিয়েছে। পাঁচ বছরের দিব্যাকে কোলে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করছিল সে। উদ্ধারকারীরা যখন তাকে জল থেকে তুলল তখনও দিব্যা তার কোলে।

মানাকুড়ি গ্রামে আড়াইশ' খৃষ্টান পরিবারের বাস ছিল। পাথরের পাঁচিল ভেঙে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়েছে গ্রামে। হোলিক্রস চার্চ ভেঙে পড়েছে। পাকাবাড়ি ভেঙে পড়েছে। প্রাণ বাঁচাতে সকলে দৌড়চ্ছে সমুদ্র থেকে দূরে। পরে ৩৯জন মানুষের গণকবর হল।

কিঝিপুথুপাত্তুর সমুদ্রতটে ক্রিকেট খেলছিল জন কুড়ি কিশোর। ঢেউ তাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূর। পরে আবার ফিরিয়ে দেয় তীরে। তারা বাসে উঠে পড়ে। দুদিন পরে খবর আসে ছেলেরা কিলিনুরে আটকে পড়েছে। পরে বাড়ি ফিরে আসে।

কন্যাকুমারী জেলায় পেরিয়াভিলা গ্রামে মৃত মানুষের স্তূপ। পূতিগন্ধময় পরিবেশ। গণকবর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দেখা গেল, মৃতা মায়ের কোল ঘেঁসে দু বছরের শিশু নড়ে উঠেছে। তখনো বাঁচার তাড়নায় ধুকপুক করছে তার ছোট্ট হৃদয়খানি।

সমুদ্রের এই রোষকে জাতীয় বিপর্যয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তামিলনাড়ুর পরেই দুর্গত এলাকা অন্ধ্রপ্রদেশ। সমুদ্র বন্দর মছলিপত্তনমে পূর্ণিমার আগের দিন সমুদ্র স্নানে নেমেছেন পুণ্যার্থীরা। সুনামি এখানে ভেঙে পড়ে সকাল ৯টা নাগাদ। সেখানে মাঙ্গিনাপুডি সৈকতে ৩ মিটার উঁচু ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছেন অনেকে। কৃষ(া, প্রকাশম, গুন্টুর, নেলোর জেলায় মৎস্যজীবী অনেক মানুষের খোঁজ মিলছে না। পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরীও সুনামি-প্রভাবিত এলাকা।

পণ্ডিচেরী ও কেরলেও সুনামির তাণ্ডব পৌঁছেছে। পণ্ডিচেরীর কারাইকালে জীবনহানির খবর আছে। পিল্লাচাভাডি গ্রামের বাসিন্দা অঙ্গলাম্মা-পুঙ্গোধাইরা প্রাণে বাঁচলেও ছেলেপুলে নিয়ে সমুদ্রের ধারেকাছে যেতে ভীত। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সত্যা খুঁজে বেরাচ্ছে তার

চার বছরের ছেলে সাবিনেস্ক-কে। সে যে ভেসে গিয়েছে, সেটা মানতে পারছে না। মণ্ডিপাথর গ্রামে শান্তির বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী ভেসে গিয়েছে। তার পলকা ঘরের উপর চেপে বসেছে জলযান।

সিঙ্গাপুর থেকে ফোন করেছিল বিজয়কুমার। চাকরি করে সেখানে। ফোন করেছে পণ্ডিচেরির নাল্লাভুর গ্রামে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে। বলেছিল — প্রবল তুফান আসছে, সমুদ্র থেকে দূরে সরে যাও। এই একটি সংবাদের জোরে গ্রাম শুদ্ধ সকলে সাগরের গ্রাস থেকে বেঁচে গিয়েছিল। অথচ এদেশে যখন সমুদ্র-উপকূলে প্রলয় নেমেছিল, তখন কেউ কোথাও ফোন করে একটিবার সঙ্কেত জানাতে পারেনি।

পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কেরলের কোলাম ও আলাপুঝা জেলায় মারা গিয়েছে বেশ কিছু লোকজন। কুন্নুর কোঝিকোড়েও জলোচ্ছ্বাস হয়েছে। কোভালম সমুদ্রসৈকত থেকে লোকজনকে সরে যেতে বলা হয়েছে।

সাত বছরের ধিনাকরন আদর করে কুকুরটির নাম রেখেছিল সিলভাকুমার। ঢেউ যখন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আদুরে কুকুর সিলভাকুমার জলে ঝাঁপিয়ে টেনে তুলল ধিনাকরনকে। তার মা সঙ্গীতা জানাচ্ছে — কুকুরটার জন্যেই সে তার ছেলেকে ফিরে পেল। ভাবা যায়! কত রকমভাবে যে মানুষের জীবন বাঁচে!

শুধু ছেষট্টি বছরের বৃদ্ধ রায়াপ্পান শান্ত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলে — ওটা রা'খ'স, সবকিছু গিলে ফেলতে ছুটে এসেছিল। না, ওর দিকে আর চাইতে ইচ্ছে করে না।

শ্রীলঙ্কা

প্রাচ্য দেশের মুক্তো বলে খ্যাতি শ্রীলঙ্কার। প্রাচীন নাম সিংহল। ১৯৭২ সালে নাম বদল করা হয় যদিও ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস মেলে ১৯৪৮ সালে। পূর্ব পশ্চিম দখিন উপকূলে জোয়ার এসেছে বেলা দশটা নাগাদ। জলের উচ্চতা ছিল ৫ মিটার পর্যন্ত। রাজধানী কলম্বো দু মিনিটের মধ্যে পাঁচ ফুট জলে ডুবে যায়। জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল প্রায় ৩০০ জন কয়েদী। জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান্সেলর হেলমুট কোল তখন কলম্বোর এক রিসর্টে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে উদ্ধার করে আনে বায়ুসেনারা।

উত্তর-পূর্বের নৌঘাঁটি ত্রিঙ্কোমালি আট ফুট জলের নিচে চলে গিয়েছে। ভয়ানক 'খয়'খতি হয়েছে সেখানে। দখিনের গাল প্রদেশ ভেসে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাস বিধ্বস্ত। প্রসূতি সদন থেকে অন্তঃসত্ত্বাদের ডাক্তাররা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। মৃতের সংখ্যা অজানা বেনতোতায়। বাত্তিকালোয়ায় প্রথম দফায় সহস্রাধিক মৃত্যুর খবর এসেছে। ভেসে গিয়েছে রেলস্টেশন পায়াগালা। এবং আক্কারাইপাত্তুর এসটিএফ শিবির, মুত্তুরের থানা। কলম্বো থেকে ১৩০ কিমি দূরের মাতারার জেল ভেঙে চুরমার। জেলকর্তা (মি মারজুক বিপদ বুঝে ৪১০ বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছেন। পরে ১০০ জন ফিরে এসে আত্মসমর্পন করে। বাকিদের খোঁজ নেই। বলা যায় না, তারাও ভেসে যেতে পারে।

কলম্বো থেকে গাল যাচ্ছিল সি কুইন রেলগাড়ি। ১,৬০০ যাত্রী নিয়ে। সমুদ্র দানব তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে আস্ত রেলের বগি। ২০০ মিটার দূরে। অন্তত ১০০০ যাত্রী মৃত। আশ্চর্য রকমে বেঁচে গিয়েছে নিমন্তিকা। লাশকাটা ঘরে তখনো তার দেহে প্রাণ ছিল। বাবা-মা হারিয়ে সে বেঁচেছে না মরেছে কে জানে!

ঐ ট্রেনের যাত্রী ছিল কীর্তিকুমার ও রঞ্জিনী। পারালিয়া স্টেশনের কাছে হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল। সকলে ভাবল চেন টানল বোধ হয় কেউ। অমনি জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে জল ঢুকতে আরম্ভ করল। মরিয়া হয়ে দরজা-জানালা ভেঙে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল অনেকে। কয়েক মিনিট পরে ১০ মি উঁচু জল-প্রাচীর আছড়ে পড়ল ঝাউবনে ঢাকা তীরে। ট্রেনটাকে ছুড়ে ফেলে দিল অমিত শক্তি(তে। কীর্তিকুমার-রঞ্জিনী ট্রেনেই বসেছিল রড আঁকড়ে। তলিয়ে গিয়েও রড ছাড়েনি। তিন মিনিট পরে জল নেমে গেল। দেখল — তারা বেঁচে আছে, আহ্, তারা বেঁচে আছে। আরেক ট্রেনযাত্রী কীর্তিলাল বাঁচাতে পেরেছে স্ত্রী ও তিন সন্তানকে।

পর্যটন কেন্দ্র উনাওয়াত্তুনায় সিংহলী যুবক তিলিক সৈকতে তিলতিল করে গড়ে তুলেছিল হোটেল। সবই এখন ধ্বংসস্তূপ। একই খবর ডোন্দ্রা হেড, টাংগালা, হামবানটোটায়।

কাল বিলম্ব না করে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা সরকার। আবেদন করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্যে।

অন্যত্র

মালদ্বীপের রাজধানী মালের দুই-তৃতীয়াংশ চলে গিয়েছে জলের তলায়। ২০০ দ্বীপের মধ্যে ১৩০টি জলমগ্ন। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ। প্রথম দাপটে ১৯জন ভেসে গিয়েছে বলে খবর।

দ(িণ মালদিভে হাকুরা রিসর্ট 'খ'তিগ্রস্ত। 'খ'তিগ্রস্ত হয়েছে মোলাকু অ্যাটল। ৮২ জন নাগরিক মারা গিয়েছে। বৃটিশ নাগরিক স্টিফেন বোল্টন, পত্নী রে এবং তিন সন্তান নিয়ে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। জলোচ্ছ্বাস বাড়ছে দেখে তোয়ালে দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলেন নিজেদের। ছেলেমেয়েদের তুলে নিয়েছিলেন পিঠের উপর। পাঁচ ঘন্টা পরে জল নেমে যায়। বেঁচে গিয়েছেন সকলে।

আন্দামানের ৬০ কিমি উত্তরে মায়ানমারের কোকো দ্বীপপুঞ্জে হাজার খানেক মানুষের বসবাস রয়েছে। আন্দামানের এত 'খ'য়'খ'তি হওয়া সত্ত্বেও তারা সকলেই প্রায় বেঁচে গিয়েছে। পশ্চিমের পাহাড় তাদের র'খ'া করেছে।

সোমালিয়ায় সুনামি আঘাত করলেও তেমন 'খ'য়'খ'তির সংবাদ নেই।

দখিন আফ্রিকায় মৃত ১০ এবং নিখোঁজ ১৮৪ জন।

সেভাবে আঘাত করেনি পাশের বাংলাদেশ এবং মায়নামারে। র'খ'া পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যাও।

৫। 'খ'য়'খ'তির খতিয়ান

প্রথমে বোঝা যায়নি জীবনহানি কতজনের হয়েছে বা 'খ'য়'খ'তির পরিমাণ কতটা। যত সময় যাচ্ছে ততই মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে লাগল লাফিয়ে লাফিয়ে। প্রথমদিনে মৃতের সংখ্যা অনুমিত হয়েছিল ১৫,০০০ মধ্যে। সোমবার ২৭শে ডিসেম্বরে তা বেড়ে হল — ২৩, ৮২০ জন। তার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় — ৪,৭০০ জন, শ্রীলঙ্কায় —১২,০০০ জন, ভারতে —৬,৮০০ জন এবং থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মায়ানমার মিলিয়ে — ৩২০ জন।

২৮শে ডিসেম্বর মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল — ৫৫,০০০। তার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় — ১৯,০০০ জন (বেসরকারী মতে ২৭,০০০), শ্রীলঙ্কায় — ২৫,০০০ জন, ভারতে — ১০,০০০ জন (যার মধ্যে কেবল আন্দামান-নিকেবরে — ৭,০০০ জন) এবং থাইল্যান্ড — ৮০০ বিদেশী পর্যটকসহ ১,৫১৬ জন (বা ২,০০০ জন), মালয়েশিয়া-মায়ানমারে — ৩২০ জন।

২৯শে ডিসেম্বর মৃতের সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। হল — ৮০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ এর মধ্যে। তার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় — ৪৫,০০০ থেকে ৮০,০০০, শ্রীলঙ্কায় — ৩০,০০০, ভারতে — ১৫,০০০ (আন্দামান এলাকার — ১০,০০০ জন নিয়ে) এবং থাইল্যান্ড — ৮০০ বিদেশী পর্যটকসহ ২০০০, মালয়েশিয়া, মায়ানমারে — ৩২০। ভারতে এই ঘটনা জাতীয় বিপর্যয় বলে ঘোষিত হল।

১লা জানুয়ারী, ২০০৫। দুঃস্বপ্নের বছর শেষ হল। এক সপ্তাহের মধ্যে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ১,৫০,০০০ । এখনও নিখোঁজ অনেকে। তারা মৃতই ধরে নেওয়া যায়।

ইন্দোনেশিয়ায় মৃত ল'খ'াধিক। তার মধ্যে কেবল বান্দা আচেতে মৃত ৪০,০০০ এবং আচে প্রদেশে কমপ'খ' ৯৪,০০০।

শ্রীলঙ্কায় মৃত ৩০,৮৮২, নিখোঁজ ৫,০০০ এবং আহত ১২,০০০।

থাইল্যাণ্ডে কমপ'খ' ৪,৮০০ জন মারা গিয়েছে। তার মধ্যে খাও-লাকে অর্ধেকের বেশি হবে। ফিফি দ্বীপে ৬০০ জনের মধ্যে ১৪১ জন বিদেশী, ১৫৭ জন থাই। বাকিদের শনাক্ত(করা যায়নি। নিখোঁজ ৬,০০০ জন। মালদ্বীপে মৃত ৭৫ জন।

ভারতে মোট মৃতের সংখ্যা ১৬,০০০। তামিলনাড়ুতে মারা গিয়েছে সবথেকে বেশি। নাগাপত্তিনামে ৫,০০০ মৃত বলে আশঙ্কা। কুড্ডালোরেও প্রায় ওরকম। তারপর অন্ধ্র পণ্ডিচেরী এবং কেরলে। তবে সর্বাধিক প্রাণহানি ও 'খ'য়'খ'তি হয়েছে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। গ্রেট আন্দামানিজের ৪৯ জন, ওঙ্গিদের ৯৬ জন, সেন্টিনেলিজদের ৩৯ জন, জারোয়াদের ২৬৬ জন বেঁচে আছে। খোঁজ নেই শোম্পেন উপজাতির ৩৯৮ জনের ও নিকোবরি ৩০০০ জনের। অন্তত ৬৫৬ জন নিকোবরি মারা গিয়েছে।

হিসেবটা এখনো সম্পূর্ণ নয়। মৃত মানুষের ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে দেয়ালে। নিখোঁজ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে স্বজনেরা। মৃত্যুর সংখ্যা থেকে 'খ'তির সবটা বোঝা সম্ভব নয়।

সার্বিক 'খ'য়'খ'তির পরিমাণ অপরিমেয়। রাস্তা সেতু কালভার্ট জেটি ভেঙেছে। ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ব্যাহত। পানীয় জলের সমস্যা প্রবল। গবাদি পশু মারা গিয়েছে। 'খ'তি হয়েছে চাষজমির। ভেসে গিয়েছে বা 'খ'তিগ্রস্ত হয়েছে মৎস্যজীবীদের নৌকো-ট্রলার।

৬। ত্রাণ

এমন অভাবিত বিপর্যয় মোকাবিলার জন্যে বিশ্বজোড়া সাহায্যের হাত এগিয়ে আসছে।

ভারত নিজদেশে প্রথমে ৫০০ কোটি টাকার ঝুলি নিয়ে নেমে পড়ল ত্রাণে। সবথেকে 'খ'তিগ্রস্ত এবং দুর্গম এলাকা হল দ্বীপদেশ আন্দামান-নিকোবর। সেখানে ত্রাণ ও উদ্ধারের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সরকার ও অন্যান্য সেবা সংগঠন। নিজের দেশের ঘোর দুর্দশার মধ্যেও ভারত দ্রুত শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া ত্রাণ সাহায্য পাঠাল। তার কিছুটা মানবিক কারণে কিছুটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্যে। আভ্যন্তরীণ ত্রাণকার্যে তহবিলের পরিমাণ বেড়ে ২৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। তবু তা পর্যাপ্ত নয়। প্রথমে আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেও পরে পুনর্গঠনে কাজের বহর দেখে আন্তর্জাতিক ভাণ্ডারের কাছে সাহায্য চাইল।

এই বিশাল বিপর্যয় সামলাতে এগিয়ে এসেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ, মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান, জার্মান, রাশিয়া, চিন ও অস্ট্রেলিয়া। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়েছে মোট ৫০ কোটি ডলার সাহায্য দরকার। তার মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জ দিচ্ছে ২৫ কোটি ডলার। মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র প্রথমে যৎসামান্য ডলার দিয়ে দায় সারতে চেয়েছিল। পরে পরিমাণ বাড়িয়ে প্রথমে ৩.৫ কোটি ডলার, পরে ৩৫ কোটি ডলার করেছে। বৃটেন দিচ্ছে ৫ কোটি পাউণ্ড। ইউরোপীয় ইউনিয়ন দুদফায় ১৭ কোটি এবং ১৩ কোটি ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ৭৬.৫০ কোটি ডলার, চিন ৬ কোটি ডলার ও জাপান ৫০ কোটি ডলার।

এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি(ও প্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য করছে। নানা অনুষ্ঠান করে অর্থ সংগ্রহ করে ত্রাণ তহবিলে জমা করছে।

এখন পর্যন্ত ৪০০ কোটি ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি মিলেছে। আবার বলছি — প্রতিশ্রুতি। এর মধ্যে কতটা বাস্তবে হাতেপাওয়া যাবে তা বলা দুষ্কর। অতীতের অভিজ্ঞতা বলে — দাতারা যা দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন, ততটা তারা দান করেন না। অতি সামান্যই মেলে। তা ছাড়া দাতা দেশের দানের মধ্যেও নানা জটিল প্রক্রি(য়া আছে। আসলে তারা অনেক খরচ 'ত্রাণকর্ম বাবদ খরচ' হিসেবে দেখিয়ে তা ত্রাণ তহবিল থেকে কেটে নেন। যদি আগের দেওয়া ঋণের পরিশোধযোগ্য বকেয়া থাকে তাও কেটে নেন। আবার এক ত্রাণে মঞ্জুর-করা তহবিল থেকে কখনো অন্য ত্রাণতহবিলে চালান করে দেয়।

দুর্গত অঞ্চলে ত্রাণ বন্টনও এক কঠিন সমস্যা। এর মধ্যেও দুর্নীতি বাসা বাঁধে। লুঠপাট চলে। প্রকৃত দুর্গত মানুষদের বঞ্চনা করে চতুর মানুষ প্রেরিত সাহায্য আত্মসাৎ করে।

এরই মধ্যে অনাথ শিশুদের নিয়ে অমানবিক কাজকর্ম শু(করেছে কিছু মানুষ নামের জন্তুরা। নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে। শিশুদের অভিভাবক সেজে ত্রাণশিবির থেকে সাহায্য নিচ্ছে, আত্মীয় সেজে 'খ'তিপূরণের টাকা নিচ্ছে। দত্তক নেওয়ার নাম করে ভার নিয়ে বিত্রি(করে দেওয়া হচ্ছে। মেয়েদের যৌনব্যবসায়ে লাগানো হচ্ছে। তাদের ধর্ষণ ও (ীলতাহানির খবর আসছে।

৭। পূর্বাভাষ নিয়ে ব্যর্থতা

বছর পাঁচেক আগে টি-এস মূর্তি এবং এ বাপাত নামে দুজন ভারতীয় বিজ্ঞানী ৩টি এলাকা সুনামি-প্রবণ বলে চিহ্নি(ত করেছিলেন — (১) আন্দামান সাগর, (২) বালুচিস্তানের কাছে আরব সাগর এবং (৩) শ্রীলঙ্কার দখিন-পশ্চিমে কয়েক শ' কিমি দূরে ভারত মহাসাগর।

জানা গেল যে, ক্যালটেকের ভূবিজ্ঞানী কেরি শে কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় ভূকম্পের তথ্য বি(-ষণ করে অনুমান করেছিলেন — ইন্দোনেশিয়ায় বড়ো ভূকম্পন-সুনামি আসতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার সরকার তখন তাঁর কথায় কান দেয়নি। তবু তিনি নিজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মেন্তাওয়াই দ্বীপে ৫,০০০ প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন। কাজে লাগেনি সে বার্তা।

মাদ্রাজ বি(বিদ্যালয়ের ফলিত ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক রাজে(র রাও এবং গবেষক বেঙ্কটনাথন গত দেড় বছর ধরে ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্বাভাষ নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁরা ২২ ডিসেম্বর নাগাদ আমেরিকার জিয়লজিকাল সার্ভে এবং নাসার দপ্তরে জানিয়েছিলেন যে সুমাত্রাসহ সম্ভাব্য কিছু অঞ্চলে ২৫/২৬ ডিসেম্বরে নাগাদ ভূকম্প হতে পারে। তারিখটা মিলে গেল, ঘটনার সম্ভাব্য স্থানও। তবে তার মাত্রা এতটা তীব্র হবে তা অনুমান করতে পারেন নি।

প্রশান্ত মহাসাগরে এই প্রলয়কাণ্ড মাঝেমাঝে ঘটে। ১৯৬৪ সালে আলাস্কায় সুনামির পরে সং(-ষ্ট দেশগুলি পূর্বাভাষের জন্যে সুনামি নিয়ন্ত্রণ কমিটি গড়ে নানা ব্যবস্থা নিয়েছে। ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে সুনামি ঘটে না বলে ভারত-শ্রীলঙ্কা সং(-ষ্ট সুনামি পূর্বাভাষ গোষ্ঠীতে যোগ দেয়নি। এখানে সাইক্লোনই প্রধান প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

তবু কি এই সব দেশের সরকারকে আগাম সতর্কতা পাঠানো যেত না যখল প্রলয়ের পূর্বাভাষ পাওয়া গিয়েছিল? তাহলে কিছু মানুষ তো বাঁচত।

ইন্দোনেশিয়ার খে'ত্রে কিন্তু তা নয়। তারা ওই ব্যবস্থার অংশীদার। তবু তারা নিজেদের বাঁচাতে পারল না। কেন? সে এক করুণ কাহিনী। কিছু মানুষের অকর্মণ্যতার চরম উদাহরণ।

এদিকে ২৬শে ডিসেম্বরে সকালে সুনামি ওয়ার্নিং সিস্টেমের ভূতত্ত্ববিদগণ জানতে পেরেছিলেন যে, সুমাত্রার কাছে এক ভয়ানক বিপর্যয় ঘটেছে ভূস্তরে। তার ফলে প্রবল জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। তারা সং(প্ত বার্তায় জানিয়েছেন — 'বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র উপকূল থেকে সরে যাও, ১৫ মিনিটের মধ্যে জলোচ্ছ্বাস আসছে। সমুদ্রতীর থেকে ১৫ মিনিট হাঁটলেই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাবে।'

যেসব জায়গায় এই বার্তার প্রয়োজন ছিল সেখানে কিন্তু ই-মেল পৌঁছয়নি। বা সেখানকার লোকজন সেদিকে নজর দেয়নি। তাদের দাবী — সং(-ষ্ট দেশের দূতাবাসে খবর দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বিদেশ দপ্তর মারফৎ যোগাযোগেরও চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হয়নি। ফলে সেসব চেষ্টা চেষ্টাই নয়। ভাবতে অবি(াস্য লাগে যে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের মতো দেশ অন্য দেশে যোগাযোগ করতে পারেনি শুধু তাদের ই-মেল ঠিকানা ছিল না বলে! এও কি সম্ভব!

হনলুলুর আন্তর্জাতিক সুনামি পর্যবে'খ'ণ কেন্দ্র থেকে মার্কিন কর্তৃপ'খ' পূর্বাভাষ পাঠিয়েছিল। তা পাঠানো হয়েছিল নানা জায়গায়। ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যাণ্ড অ্যাট্‌মস্‌ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হনলুলু অফিসের ডিরেক্টর (ইউ-এস প্যাসিফিক ওয়ার্নিং সিস্টেমের প্রধান) চার্লস ম্যাকক্রি জানাচ্ছেন — তারা উপকূলের মানুষকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন। তবে সং(-ষ্ট এলাকার ঠিকানা তাদের অ্যাড্রেস বুকে ছিল না। ফলে খবর পাঠানো যায়নি। শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল।

হাওয়াই কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের ১৫ মিনিটের মধ্যে বুঝতে পেরেছিল কি হতে পারে। কিন্তু আক্রান্ত দেশে যথাসময়ে খবর পৌঁছয়নি। শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রপতিভবনে খবর পৌঁছয় তবে অনেক পথ ঘুরে। এবং তাণ্ডবের পরে। মরিশাস-মাদাগাস্কারে খবর দিয়েছিল তারা। কেনিয়া-সোমালিয়াকেও সতর্ক করার চেষ্টা হয়েছিল। ভূপদার্থবিদ ব্যারি হিরসর্ন জানান — ওয়াশিংটনের মাধ্যমে তারা সতর্কবার্তা পাঠাতে চেষ্টা করেন। ইন্টারনেটে দুটি বুলেটিনও প্রকাশ করেন।

সারা দুনিয়া এখন আমেরিকাকে দুষছে। খানিকটা তো সঙ্গত কারণেই। দুষছে বিশেষ করে চার্লস ম্যাকক্রি-কে। তারা বলছে — মশাই, আপনি ইন্টারনেট থেকে নাম্বার নিয়ে থাইল্যাণ্ডের হোটেলেও তো অন্তত সতর্কবার্তা পাঠাতে পারতেন।

একথা সত্যি, খবর পাঠাতে পারলেও ওই সকল দেশের প'খে' উপকূল থেকে সমস্ত মানুষজন সরানো কতটা সম্ভবপর হত তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তবু কিছু মানুষ যে বাঁচত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্রসঙেঘর সমুদ্র চর্চা বিভাগ থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা ভূকম্পের পনেরো মিনিটের মধ্যে বুঝতে পেরেছিল — সুনামির সৃষ্টি হতে চলেছে। সতর্কবার্তা পাঠতে হবে। কিন্তু কোথায়? না, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিতে। সুনামি তো ওখানে ধেয়ে যাচ্ছে না। তবে সেখানে কেন? না, সেখানেই তো সাধারণত সুনামি হয়। সুতরাং সতর্কবার্তা গেল সেদিকে। দখিন-পূর্ব এশিয়ায় নয়। মতিভ্রম আর কাকে বলে!

ইন্দোনেশিয়া মার্কিন সতর্কবার্তা এবং রাষ্ট্রসঙেঘর সতর্কবার্তা পেয়েছিল কিনা জানা নেই। পেলেও হাতে সময় বেশি ছিল না। কিন্তু সতর্কবার্তা জারি করলে তা অন্যত্র জানানোর সম্ভাবনা ছিল।

দুঃখের কথা হল তাদের নিজস্ব যন্ত্রেও ধরা পড়েছিল প্রবল ভূকম্পন। গোটা পঞ্চাশেক রিপোর্ট জমা পড়েছিল তা নিয়ে। জাভা দ্বীপের পশ্চিম দিকে উত্তর উপকূলে অবস্থিত জাকার্তার কেন্দ্রীয় দপ্তরে। দেশজুড়ে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা জারি করার আগে তারা তখন অপে'খ'া করছিল বিশেষ দপ্তরের রিপোর্টের জন্যে। সুনামি পরিমাপ করার বিশেষ সিসমোগ্রাফ যন্ত্র বসানো হয়েছিল জাভায়। ১৯৯৬ সালে। তার রিপোর্টের জন্য । দুর্ভাগ্য কেমন দেখুন, এই যন্ত্রটি নতুন বাড়িতে উঠে গিয়েছে ২০০০ সালে। কিন্তু তার টেলিফোন লাইন ঠিকঠাক চলছিল না। সেই কালান্তক সকালে দপ্তরের সমস্ত টেলিফোন লাইনই নাকি বিকল ছিল। ফলে জাকার্তায় সদর দপ্তরে বিশেষ সতর্ক বার্তা পাঠানো যায় নি। সেই বিশেষ বার্তা না পাওয়ার জন্যে সরকারি নোটিশও জারি করা হয়নি। একে রবিবার তায় বড়োদিনের ছুটির মেজাজ। কাজের মেজাজ থাকে?

নোটিশ জারি করা হলে কি তা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ত না? প্র(হল, এমন একটা পূর্বাভাষ সং(-ষ্ট দপ্তরের কর্মীরা অন্য কোনভাবে পাঠানোর চেষ্টা করতে পারল না? অন্য কোন ফোনবুথ থেকে, পাশের বাড়ি থেকে, মোবাইল থেকে? এটা কি বি(্বাস করা যায় যে, স্রেফ টেলিফোন লাইন ছিল না বলে মানুষ বাঁচানোর দায় কর্মীদের নেই। কি দুর্ভাগ্য! এত বড়ো বিপর্যয়ের পূর্বাভাষ পেয়েও তা কাজে লাগানো সম্ভব হল না সামান্য অজুহাতে।

ভারতের বিশেষ করে আন্দামান-নিকোবর প্রশাসনের পূর্বাভাষ সম্পর্কে ব্যর্থতা নিয়ে কথা উঠেছে। সুনামি আছড়ে পড়েছিল নিকোবরের দ(ণতম প্রান্তে ইন্দিরা পয়েন্টে। আধ ঘন্টার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রেট নিকোবর, লিটল নিকোবর, কাছাল, কামোর্তা, কার নিকোবর হয়ে আরো উত্তরে লিটল আন্দামান, দ(ণ আন্দামান ও পোর্ট ব্লেয়ার, মধ্য ও উত্তর আন্দামান। দ্বীপের প্রশাসন নৌবাহিনী যদি দিল্লিতে খবর পাঠাত, তবেও বেশ কিছু জীবন বাঁচানো যেত।

জলপ-াবন ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে সকাল ৯টা নাগাদ এবং শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছিল প্রায় ৯-৩০ মিনিটে। সুতরাং হাতে অনেকটা সময় ছিল। অন্য সূত্রমতে কুড্ডালোরে প্রথম আঘাত আসে সকাল ৮-টায়। মেরিনা বিচে ৮-৪০ মিনিটে। তাহলে হাতে চল্লিশ মিনিট সময় ছিল। এর মধ্যে সম্পত্তি না হোক প্রাণ তো কিছু বাঁচানো যেত। মাদ্রাজ আই-আই-টির অধ্যাপক অশোক ঝুনঝুনওয়ালা অভিমত এরকম।

আসলে কেউই বুঝতে পারেনি যে ভূমিকম্প কতটা প্রবল হয়েছে। আর তার ফলে যে সুনামির সৃষ্টি হতে পারে সেকথা মাথায় আসেনি কারো। ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে তো ওটা হয় না —এই ধরাবাঁধা থিয়োরি বুঝতে দেয়নি তাদের। ভাবতে দেয়নি আবহবিদদের। আমাদের সংস্কার, অশি(া ও স্বভাবগত কুঁড়েমিও হয়তো শেষর'খ'া করতে পারত না, যেমন পারে না পোলিও নির্মূল করার খে'ত্রে।

৮। অতীতের ভূকম্প ও সুনামির খবর

বাইবেলে যে মহাপ্রলয়ের কথা বলা হচ্ছে তাও সুনামি কিনা কেউ কেউ ভাবতে বসবেন। কিন্তু ৬.৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েছিল অতিকায় সরিসৃপ জাতীয় ডায়নোসর গোত্রের প্রাণীরা। যদি তা বিশাল উল্কাপাতের ফলে ঘটে থাকে, তবে সেই মহাপ্রলয় আবহাওয়ার বিশাল পরিবর্তন ছাড়াও বড়ো ধরণের সুনামি ছিল। তা ছাড়া আর কীই বা হতে পারে?

ঐতিহাসিক কালে ৩৭৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীসের হেলিকে শহরের অবলুপ্তি ঘটেছিল। সম্প্রতি ২০০০ সালের অক্টোবরে এজিয়ান সমুদ্র উপকূলে লুপ্ত শহরের খোঁজ মিলেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন ঐ গ্রীসীয় শহরের লুপ্ত হওয়ার কারণ সুনামি। ৭৯ খৃষ্টাব্দে ভিসুভিয়াসের অগ্নি উদগীরণের খবর আমরা জানি। ধ্বংস করে দিয়েছিল গ্রীসের শহর পম্পেই ও হারকিউলানিয়াম।

১৫৫৬ সালে চিলের শেনশি প্রদেশের উত্তরভাগে যে ভূমিকম্প হয়, তাতে ৮,৩০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৭০৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর টোকিও ভূকম্পে ২,০০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকে (১৭৩৭ সালে) কোলকাতায় ভূকম্প হয়েছিল। বহু মানুষের হতাহত হয়েছিল তখন। বলা হয়, মৃতের সংখ্যা ছিল ৩,০০,০০০। তবে সংখ্যাটি সন্দেহজনক। আমরা কোলকাতার ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন। তখন শহর এতটা জনবহুল ছিল না।

১৭৫৫ সালের ১লা নভেম্বর ইউরোপের ভূকম্প 'লিসবন কম্পন' নামে খ্যাত। প্রবল কম্পনে শহরের একাংশ ধূলিস্মাৎ হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রে উঠেছিল সুনামি। প্রায় ১৫ মিটার উঁচু ছেউ উঠেছিল। তার উপর আগুন লেগে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে লিসবন শহরের প্রভুত 'খ'তি হয়েছিল। সেবারে নিহত হয়েছিল ৬০,০০০ মানুষ।

১৭৮৩ সালে মধ্য-দখিন আইসল্যাণ্ডের আগ্নেয়গিরি লাকির বিস্ফোরণ হয়। চলে দুবছর ধরে। প্রত্য'খ' হতাহত তেমন না হলেও আকাশ এমন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে বিস্তীর্ণ শস্য'খে'ত নষ্ট হয়ে যায়। 'খু'ধায় মারা পড়ে বহু পশুপ্রাণী, সঙ্গে অন্তত দশ হাজার মানুষ।

১৭৯৭ সালে জাভা-সুমাত্রায় আনুমানিক ৮.২ মাত্রার ভূকম্প হয়েছিল।

১৮১১-১২ সালে মিসিসিপির নিউমাদ্রিদে ভূমিকম্প হয়।

১৮১৫ সালে জাভার পূর্বে মাউন্ট টাম্বোরো ফেটে পড়েছিল প্রবল বিস্ফোরণে। আকাশ ঢাকা পড়েছিল পাথর আর ধূলিকণায়। তার প্রভাবে বছরখানেক ধরে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে গিয়েছিল ভীষণরকমে। ১৮৩৩ সালে জাভার পশ্চিমে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হয়েছিল। পরপর চারবার। ভূকম্পন মাত্রা ৮.৭র কাছাকাছি ছিল বলে অনুমান। তার ফলে সুন্দা ও সুমাত্রায় প্রবল জলোচ্ছ্বাস উঠেছিল।

১৮৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে আন্দামানে ভূকম্প হয়েছিল। তবে তার তীব্রতা সম্ভবত এতটা ছিল না। মাত্রা ৭.৯র মতো হবে। তখন হয়তো সুনামির সৃষ্টি হয়েছিল। দুবছর পরে

১৮৮৩ সালের ২৭শে আগষ্ট জাভা-সুমাত্রায় সুনামির ধাক্কায় মারা গিয়েছিল ৩৬,০০০ মানুষ। ১৮৯৬ সালে জুন মাসে মহাপ্রলয় আঘাত করেছিল জাপানের সমুদ্র উপকূলে। মৃত মানুষের সংখ্যা ছিল ২৭,০০০ জন।

১৮৯৭ সালের ১২ই জুন হয় আসামের ভূমিকম্প।

১৯০২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মার্তিনিক দ্বীপের মাউন্ট পেলি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হয়। প্রধান শহর সেন্ট পিয়েরের ৩৮,০০০ মানুষ তিন মিনিটের মধ্যে মারা যায়। বেঁচে গিয়েছে একজন মৃত্যুদণ্ড পাওয়া কয়েদী। অথচ সেদিনই নাকি তার দণ্ড কার্যকর করার কথা ছিল।

ভূকম্পন মাত্রা আগে তো তেমন করে মাপা যায়নি। ১৯২৯ সালের নভেম্বরে কানাডার কাছে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের গ্রাণ্ড ব্যাঙ্কের দখিন দিকে ৭.২ রিখটার স্কেল-মাত্রার ভূকম্প এবং তজ্জনিত সুনামির আত্র(মণ হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে হয়েছিল বিহারের ভূমিকম্প। ১৯৩৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তুরস্কে যে ভূমিকম্প হয়েছিল রিখটার স্কেলে তার কম্পনমাত্রা ছিল — ৭.৯। মৃত — ৩৩,০০০।

১৯৪১ সালে আন্দামান-মায়ানমারের মধ্যবর্তী আন্দামান সাগরে সুনামির সৃষ্টি হয়েছিল। তার ধাক্কা এসে পৌঁছেছিল আন্দামান-নিকোবরে। তবে তার জোর ছিল না তেমন।

১৯৪৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মেক্সিকো শহর থেকে ৩২০ কিমি পশ্চিমে মেক্সিকোর পারিকুটিন গ্রামে সবুজ খেতের মধ্যে হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এক আগ্নেয়গিরি। আট মাসের মধ্যে দেড় হাজার ফুট উঁচু হয়ে গেল ছাইচাপা গিরিচূড়া। ১৯৪৬ সালে আলাস্কার অ্যালেয়ুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ধেয়ে এসেছিল ৩৫ মিটার উঁচু ঢেউ। সেবার হাউই দ্বীপপুঞ্জেও ছুটে গিয়েছিল সমুদ্র দানব। হিলো শহরকে তছনছ করেছিল।

১৯৫০ সালের ১৫ই আগস্ট আবার আসামে ভূকম্প হয়। ১৯৫২ সালে রাশিয়ার উত্তর পূর্বে কামস্কাটকায় ভূকম্পন হয় এবং তার ফলে সুনামির সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৬০ সালের ২২শে মে দখিন চিলিতে যে ভূকম্প হয় তার মাত্রা ছিল ৮.৬। এর ফলে সুনামির সৃষ্টি হয়। সেবার ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে ২৫ মিটার উঁচু ঢেউ ওঠে। ১,০০০ মানুষ মারা যায়। সেবার ১০,০০০ কিমি দূরের হাউই দ্বীপ অবধি ছুটে গিয়েছিল প্রলয় দানব। তাও মাত্র ১৫ ঘন্টায়। অর্থাৎ গতিবেগ ঘন্টায় ৬৬৬ কিমি। হাউই দ্বীপের উপরকার হিলো শহরকে আবার তাসের ঘরের মতো গুঁড়িয়ে দিল নিমেষে।

১৯৬৪ সালে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের আলাস্কায় প্রিন্স উইলিয়াম স্যাণ্ডসে বিশাল ভূকম্পন হয়েছিল। আমাদের জানা সর্ববৃহৎ মাত্রার কম্পন ছিল সেটি — ৯.২। তার ফলে প্রবল সুনামির আবির্ভাব হয়েছিল। এর পরেই সুনামি পূর্বাভাষের জন্যে ২৬ দেশের কমিটি গড়ে ওঠে।

১৯৭৫ সালে হাউই দ্বীপে ভূকম্প ও সুনামি হয়। ১৯৭৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী গুয়াতেমালায় কম্পন হয় - ৭.৫ মাত্রার। মৃত — ২২,০০০। ঐ বছরে ২৮শে জুলাই চিনের তাঙ্গসানে ৭.৮

থেকে ৮.২ মাত্রার কম্পন ধরা পড়ে। মৃতের সংখ্যা বিস্ময়কর — ২,৪০,০০০। সেবার ২৩শে আগষ্ট ফিলিপাইন দ্বীপের দ(ণ-পশ্চিমে সুনামির আঘাতে ৮,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

১৯৯০ সালের ২১শে জুন উত্তর-পশ্চিম ইরানে কম্পন মাপা হয়েছে ৭.৩ থেকে ৭.৭ মাত্রার। মৃত- ৫০,০০০। ১৯৯৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারতে মহারাষ্ট্রের লাতুরে যে ভূমিকম্প হয় তার কম্পন মাত্রা ছিল ৬। মৃত — ১০,০০০।

১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে শেষবারের মতো মধ্য ও দখিন আন্দামানের ১৩৫ কিমি পূর্বে অবস্থিত ব্যারেন দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল। হালের ফাটলের সঙ্গে তার সম্পর্ক বোধহয় নেই।

১৯৯৯ সালের ১৭ই আগস্ট, পশ্চিম তুরস্কে কম্পনমাত্রা — ৭.৪, মৃত — ১৭,০০০।

২০০১ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভূকম্প হয় গুজরাতের ভুজে। কম্পনমাত্রা — ৭.৯, মৃত — ১৩,০০০।

২০০৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইরানের বামে ভূকম্প হয়েছিল। কম্পন মাত্রা — ৬.৫ এবং মৃতের সংখ্যা — ৪১,০০০।

দেখা যাচ্ছে ২৬এর গেরো বারকয়েক আছে বটে তবে তা নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসার কারণ নেই, যদি না আপনি আসতে চান। কারণ ২৬ এড়িয়েও ভূমিকম্প হয়েছে বেশ কয়েকবার। বেশ কয়েকবার ভুকম্পনের সঙ্গে সুনামির সৃষ্টিও হয়েছিল। তবে তা ভারত মহাসাগরে নয়। হয়তো যথাযথ রেকর্ড থাকলে আন্দামান-নিকোবরে অতীত সুনামির আরো খবর মিলত।

৯। সুনামির ভূ-তাত্ত্বিক কারণ

কিভাবে এমন দুর্বিপাক ঘটল বা ঘটে থাকে তার কারণ জানতে হলে, ভূতত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হবে আমাদের। প্রথমে জানতে হবে পৃথিবীর গঠনটা কেমন। জানতে হবে সৌরজগতে পৃথিবী নামক গ্রহটির আবির্ভাব ও বিবর্তন সম্পর্কে দুচার কথা।

আমরা জানি সূর্য নামক ন'খ'ত্রটির জন্ম ৫০০ কোটি বছর আগে। পৃথিবীর জন্ম একই মালমশলা থেকে, তবে সামান্য পরে — প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে।

পৌরাণিক গালগপ্প ছেড়ে যখন আমরা বিজ্ঞান-সম্মত ভাবনার পথিক হলাম, তখন প্রথম দিকে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে উত্তপ্ত পিণ্ড অবস্থায় পৃথিবী যখন গ্রহের আকার লাভ করল তখন তাপ ছেড়ে ঠাণ্ডা হওয়ার সময় কুঁচকে গিয়ে ভূত্বকের উপর উঁচুনিচু জায়গার সৃষ্টি করল। এভাবে পর্বত সমুদ্র মহাদেশ তৈরী হয়েছে।

পাল্টা প্র(উঠল — তবে তো পৃথিবীর সর্বত্র একই রকমের ভাঁজ পড়ত। সমান বিন্যাস হত। এমন এলোমেলো চেহারা হত না পৃথিবীর। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশি, দখিন

গোলার্ধে আবার বেশি হচ্ছে জলভাগ। স্থলভাগও বড্ড ভাঙাচোরা, এবড়ো-খেবড়ো। কই, তেমন সমান বিন্যাস দেখা যাচ্ছে না। তাহলে এমন ধারণা থেকে ভূত্বকের গঠন সম্পর্কে যথাযথ ব্যাখ্যা মিলছে না।

১০। পৃথিবীর গঠন

ভূ-প্রকৃতির গঠন সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞান-সম্মত ধারণা তৈরী হতে সময় লেগেছে। ইউরোপে নবজাগরণের পরে নতুন করে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের বিকাশ সম্ভব হল। পৃথিবী যে প্রায় গোলাকার একটি ভাসমান ঘূর্ণায়মান বস্তুপিণ্ড তা বুঝতে পারলুম। সাতটা মহাদেশ আর পাঁচটা মহাসাগর খুঁজে পেলুম। পৃথিবীর পর্বতমালা জয় করতে বসলুম। উত্তরমে(দখিন মে(তে মানুষ পা রাখল। মানুষের যুক্তিবাদী জ্ঞানের বিকাশ হয়েছে ধাপে ধাপে। বিশ্বাসের নিগড় থেকে মুক্তিলাভের পরেই তা সম্ভব হল।

তখন অন্যান্য শাস্ত্রের মতো ভূগোল হল। ভূতত্ব নামক সাহেবি শাস্ত্র রচিত হল। আমরা প্রধান তিন রকমের শিলাপ্রস্তর চিনতে শিখলুম। যুগ যুগ না বলে আমরা পৃথিবীর বয়সটা ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ৪৬০ কোটি বছরে নিয়ে গেলুম। যুক্তি(ও তথ্যের সিঁড়ি বেয়ে। পৃথিবীর সমগ্র অতীত সময়টাকে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি না বলে বড়ো বড়ো অধিযুগে (এরা) ভাগ করা হল। তাকে আবার ভাগ করা হল কাল (পিরিয়ড) ও যুগে (এপক)।

এখন আমরা জানি কমলালেবুর মতো পৃথিবীর ভেতরটা কেমন। উর্ধ্বাকাশে মাটির উপরে বায়ুমণ্ডল (অ্যাটমসফিয়ার)। পায়ের নিচে মাটির উপরতলে লিথোস্ফিয়ার এবং জলসমুদ্র (হাইড্রোস্ফিয়ার)। উপরের দিকটা এমন তো পৃথিবীর ভিতরের দিকটা কেমন? মানে পায়ের নিচের দিকে। নিম্নদিকে তথা অধোতলে বা পাতালে কী? পাতালটা ভারতবাসীর পায়ের দিকে হলে, আমেরিকানদের বেলায় উল্টোদিকে। আসল কথা হল উভয়ের পায়ের দিকে মানে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে।

তালিকা — ভূ-তাত্ত্বিক সময় সারণী (জিয়লজিকাল টাইম টেবিল)

১। কেনোজয়িক অধিযুগ — ১০,০০০ বছর থেকে ৬.৫ কোটি বছর আগে।
(কাল - কোয়ার্টারনারি, যুগ - হলোসিন ও প্লায়োস্টাসিন(১০,০০০ থেকে ২০ ল(বছর আগে। কাল- টার্সিয়ারি, যুগ - প্লায়োসিন, মায়োসিন, অলিগোসিন, ইয়োসিন ও পেলিওসিন(২০ ল(থেকে ৬.৫ কোটি বছর আগে।)

২। মধ্যজীবীয় (মেসোজয়িক) অধিযুগ — (কাল - ক্রীটাশাস, জুরাসিক ও ট্রায়াসিক) — ৬.৫ কোটি থেকে ২২.৫ কোটি বছর আগে।

৩। পুরাজীবীয় (প্যালিওজয়িক) অধিযুগ — (কাল - পার্মিয়ান, কার্বনিফেরাস, ডেভোনিয়ান,

সিলুরিয়ান, অর্ডিওভিসিয়ন ও কেমব্রিয়ান) - ২২.৫ কোটি থেকে ৫৭ কোটি বছর আগে।

৪। প্রি-ক্যামব্রিয়ান অধিযুগ — ৫৭ কোটি থেকে ৩৯৬ কোটি বছর আগে।

(পৃথিবীর গ্রহরূপ — ৪৬০ কোটি বছর আগে।)

পৃথিবী নামক বলটার ব্যাস ১২,৭৪২ কিমি ধরা হলে তার ব্যাসার্ধ ৬,৩৭১ কিমি। অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছতে আমাদের ৬,৩৭১ কিমি যেতে হবে। সে তো অসম্ভব ব্যাপার। আমরা পৃথিবীর বুকে সবথেকে গভীর যে জায়গাটা ড্রিল করে পেয়েছি সেটা রাশিয়ার কোলা উপদ্বীপে। ১৯৮৪ সালের কথা। খনন করতে পেরেছি মাত্র ১২ কিমি। বলতে গেলে ভূত্বকের গায়ের চামড়াও ভেদ করতে পারিনি। কি করে জানা সম্ভব হল অনেক ভিতরের এসব কথা? এতকথা? জানার রাজ্যে সেও এক বিবর্তন-ক্রিয়া। সামান্য থেকে অসামান্য ঘটনায় বা তুচ্ছ জ্ঞান থেকে বৃহত্তর জ্ঞানে উত্তরণ।

বিজ্ঞানে নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ স্যর আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) মহাকর্ষ তত্ত্ব আবিষ্কার করে বললেন — জগতের সবকিছু সবকিছুকে আকর্ষণ করে। সে এত মহা মিলনমেলা, বিশ্বপারাবারে মহা-আকর্ষণের খেলা চলছে। মানুষে মানুষে তেমন করে হোক বা না-হোক বস্তুতে বস্তুতে হচ্ছেই। যে যত বড়ো তার আকর্ষণ-'খ'মতা তত বেশি। সেকারণে বিশাল এই ধরণী আমাদের মতো তুচ্ছ জীব ও অন্যান্য জীবজন্তু-গাছপালাসহ বিশাল জলমণ্ডল বায়ুমণ্ডল পাহাড়পর্বত বুকে করে রেখেছে। এমন করে আগলে রেখেছে যে, উঁচু জায়গা থেকে ছেড়ে দিলে আমরা এক নির্দিষ্ট বেগে পৃথিবীর দিকে নেমে আসি। আসলে বেগে নয়, নির্দিষ্ট ত্বরণে। মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীরা জানে তার নাম অভিকর্ষজ ত্বরণ।

কিছুদিন পরের কথা। কোলকাতার একজন পাদরী আর্চডিকন প্র্যাট ভাবতে বসলেন — বস্তু যদি বস্তুকে আকর্ষণ করে, তবে তো বিরাট হিমালয় তার বিশাল বপুর জন্য অন্য বস্তুকে আকর্ষণও করবে। বেঁকিয়ে দেবে সুতোয় ঝোলানো রাজমিস্ত্রিদের ওলনের লাইন। কতটা বেঁকিয়ে দেবে বা ওলনের বি'খে'প ঘটাবে? হিসেব কষে বার করলেন তার মাপ। যতটা বি'খে'প হওয়া উচিত ছিল, ততটা হল না। কারণ হয়তো এই যে, পর্বতের পাথর ভূভাগের পাথরের থেকে হালকা। ফরাসী জরিপকারীরা আটলান্টিকের বিস্কে উপসাগরের ধারে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন যে,ফাঁকা হলেও সমুদ্রের দিকে বি'খে'প ডাঙার থেকে বেশি। এসবের কারণ বস্তুর মধ্যে আপে'খি'ক গুরুত্বের ফারাক। তবে তো পৃথিবীর ডাঙা সমুদ্র ইত্যাদির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। পাহাড়পর্বত উঁচু হলেও হালকা শিলার, আর সমুদ্রতল ভারী শিলার।

গ্রীক মনীষী আর্কিমিদিস (আঃ২৮৭-২১২ খৃঃপূঃ) তো কবেই বলে গিয়েছেন — ভাসমান বস্তু ভাসে প্লবতার জন্যে। লোহার টুকরো ভাসে না, ভাসে লোহার কড়াই। বরফের টুকরো ভাসে খনিকটা ডুবে। জাহাজও তাই। সে তত্ত্বের রেশ টেনে পদার্থবিদ জর্জ বিডেল অরি (১৮০১--১৮৯২) বললনে — যেমন ভাসমান হিমশৈলের উপরের দৃশ্যমান ভাগ কম,

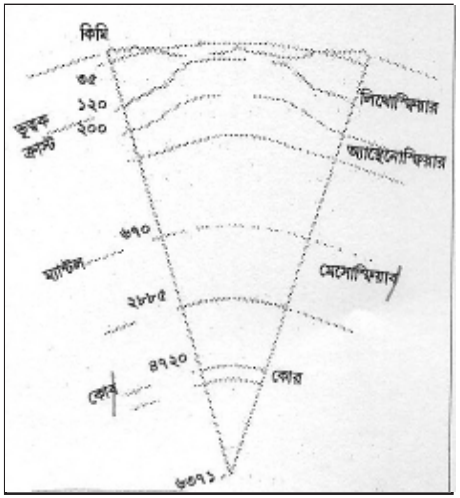

চিত্র-৩ পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন

বেশির ভাগটাই থাকে জলে নিমজ্জিত, তেমনি পাহাড়পর্বতের দৃশ্যমান অংশ খানিকটাই। বেশির ভাগটা ভূগর্ভে নিহিত রয়েছে। যেন ভূগর্ভের তরলের উপর পর্বত সমভূমি মালভূমি ভাসছে! চাপ বেশি হলে সেটা ডুবে যাবে বেশি করে। চাপ কম হলে আরো ভেসে উঠবে। ভূগর্ভের অবস্থা তরল কি? লাভা উঠে আসছে ভূগর্ভ থেকে। তা যখন তরল, তখন ভূগর্ভের অবস্থা তরল হলেও হতে পারে। যুক্তিটা এরকম। চাপের কাছে নত হয়ে ভূভাগের এই ওঠা-নামার খেলার নাম সমস্থিতি (আইসোস্ট্যাসি)। ভূপৃষ্ঠে সর্বত্র চাপ নয়। সমান সমস্থিতিও বর্তমান নেই। বৈষম্য আছে। তবে চেষ্টা থাকে এক সাম্য অবস্থায় পৌঁছনোর। দেখুন, অভিকর্ষ সম্পর্কে খোঁজ করতে করতে আমরা কেমন ভূগর্ভের খবরে চলে গেলুম।

ইতিমধ্যে ভূগর্ভের খবরাখবর জানার অন্য উপায় হাতে এসে গেল। জলে আলোড়ন হলে তা তরঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। শব্দতরঙ্গ আছে বলেই আমরা কথা শুনতে পাই। আলো বিদ্যুৎ এসবও তরঙ্গদোলে চলে। তরঙ্গ জলেস্থলে আকাশে চলাচল করে। সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ভূকম্পন বিষয়ক তরঙ্গ দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের খবরাখবর পাওয়া গেল। যন্ত্রটি ১৮৫৫ সালে ইতালির লুইগি পালমিয়েরি প্রথম তৈরী করলেন। প্রায় পঁচিশ বছর পরে আরো উন্নত মডেল বানালেন বৃটেনের জন মিলনে।

ভূকম্পনে ৪ রকমের তরঙ্গ উদ্ভূত হয়। তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জন্যে খ্যাত। প্রথম দুটিকে বলে দেহ-তরঙ্গ বা বডি ওয়েভ। যেমন — (১) পি (প্রাইমারি বা প্রেসার) তরঙ্গ ও (২) এস (সেকেণ্ডারি বা শিয়ার) তরঙ্গ। অন্য দুটিকে বলে উপরতলের তরঙ্গ বা সারফেস ওয়েভ। ভূ-ত্বকের পৃষ্ঠতল ধরে এই তরঙ্গের চলাচল। যেমন — (৩) ইংরেজ পদার্থবিদ লর্ড র‍্যালের নামে র‍্যালে বা পি তরঙ্গ এবং (৪) আগস্ট এডোয়ার্ড হুগ লাভের নামে লাভ বা এস তরঙ্গ।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের খবর এনে দিতে পারে কেবল দেহ তরঙ্গ। পি-তরঙ্গ কঠিন, তরল বা বায়বীয় মাধ্যমে চলাচল করতে পারে। এস-তরঙ্গ কেবল কঠিন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলে। ভূকম্পনের উৎস থেকে এই দুই তরঙ্গ কখন কিভাবে গ্রহণ করা হল তা থেকে ভুকম্পনের উৎসস্থল যেমন জানা যায়, তেমনি ধরা পড়ে পৃথিবীর আভ্যন্তরীন গঠনপ্রকৃতি।

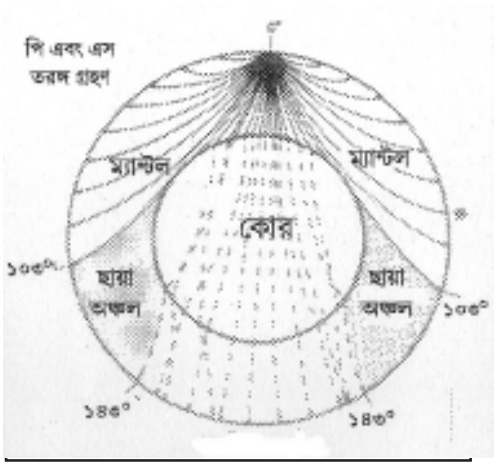

চিত্র-৪। পৃথিবীর অভ্যন্তরে শব্দতরঙ্গের প্রবাহ

জানা গেল যে, ধরণীর কেন্দ্রদেশে ৩,৪৮৫ কিমি ব্যাসার্ধ নিয়ে লোহা-নিকেলের একটি কোর বা অষ্ঠী আছে। অষ্ঠী না বলে আঁটি বললেই বুঝতে সহজ হয়। এরও তিন পর্যায় আছে। কেন্দ্রস্থল কঠিন, তার উপর নরম এবং তার উপরে তরলাবস্থা। কোরের বাইরে প্রায় ২,৬৮৫ কিমি পু(ম্যান্টল বা মেসোস্ফিয়ার মোটামুটি কঠিন অবস্থায় রয়েছে। সবার উপরে ২০০ কিমি পু(চাদরের লিথোস্ফিয়ার-অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত(পৃথিবীর ভূত্বক বা ক্রাস্ট। লিথোস্ফিয়ার কঠিন বটে তবে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার সে তুলনায় কম কঠিন। ভূত্বকের ৩৩ কিমি নিচে ভূগোলকে ভূকম্প-তরঙ্গ (প্রাথমিক তরঙ্গ) হঠাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। বেগের ধারাবাহিকতার এই উল্লম্ফনকে মোহোরোভিসিক ছেদ বলা হয়। ক্রোয়েশিয়ার ভূকম্পবিদ আন্দ্রিজা মোহোরোভিসিক (১৮৫৭-১৯৩৬)-এর নামানুসারে। ম্যান্টল আর কোরের মধ্যে আরেকটি ছেদ দেখা গেল। তার নাম রাখা হল গুটেনবার্গ ছেদ। জার্মান-আমেরিকান ভূপদার্থবিদ বেনো গুটেনবার্গ (১৮৮৯-১৯৬০) আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবীর কোরের বাইরের দিকটা (আউটার কোর) তরলাকার। উপর থেকে নিচের দিকে ঘনত্ব বাড়তির দিকে। প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব ৫.৫১৮ গ্রাম হলে, উপরতলের ঘনত্ব ২.৮ গ্রাম এবং কোরের ঘনত্ব হবে ১১.৫ গ্রাম।

<u>রাসায়নিক পদ্ধতিতে অভ্যন্তরের ভাগ</u>

ক্রাস্ট বা ভূত্বক - সমুদ্রতলে ৭ কিমি এবং মহাদেশীয় তলে ৩৫ কিমি গভীর।
ম্যান্টল - ৭ বা ৩৫ কিমি থেকে ২৮৮৫ কিমি পর্যন্ত গভীরতায়।
কোর বা অষ্ঠী - ২৮৮৫ কিমি থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত অবশিষ্টাংশ।

<u>যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অভ্যন্তরের ভাগ</u>

লিথোস্ফিয়ার - সমুদ্রতলে ৬৫ কিমি এবং মহাদেশীয় তলে ১২০ কিমি গভীর।
অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার - ৬৫ বা ১২০ কিমি থেকে ২০০ কিমি পর্যন্ত গভীরতায়।
মেসোস্ফিয়ার - ২০০ কিমি থেকে ২৮৮৫ কিমি পর্যন্ত গভীরতায়।
কোর -২৮৮৫ কিমি থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত অবশিষ্টাংশ।

অস্ট্রিয়ার এডোয়ার্ড সুয়েস (১৮৩১-১৯১৪) আরেকভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে পাঁচটি ভাগ দেখতে পান। উপরভাগের ভূত্বকে সিলিকন-অ্যালুমিনিয়ামের শিলার ভাগ বেশি বলে এটিকে 'সিয়াল' স্তর বলা হয়। সিলিকন থেকে সি এবং অ্যালুমিনিয়াম থেকে আল নিয়ে। এর নিচে রয়েছে 'সিমা' স্তর — গঠিত সিলিকন এবং ম্যাগনেসিয়াম প্রধান শিলা থেকে। সিয়ান-সিমার মধ্যে রয়েছে কোনরাড ছেদ। তার নিচে ক্রোমিয়াম-লোহা-সিলিকন-ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা গঠিত 'ক্রোফেসিমা' স্তর। তারপর নিকেল-লোহা-সিলিকন-ম্যাগনেসিয়ামের 'নিফেসিমা' স্তর। সবশেষে নিকেল-লোহার 'নিফে' স্তর।

মাটির যত নিচে যাওয়া যাবে, ততই ভিতরটা ভীষণ ভীষণ গরম লাগবে। খনির মধ্যে যারা কাজকর্ম করেন, তারা জানেন। নিচের দিকে একদিকে বাড়বে চাপ, অন্যদিকে তাপ। দেখা গিয়েছে প্রতি কিমি গভীরে অন্তত ১৬ ডিগ্রি করে তাপমাত্রা বাড়ছে। অষ্ঠীর কেন্দ্রভাগের উত্তাপ সম্ভবত ৬০০০ ডিগ্রির মতো দাঁড়াবে। আভ্যন্তরীন উত্তাপ জন্মাচ্ছে বা জন্মেছে — পৃথিবীর গঠনকালীন অবশিষ্ট তাপ থেকে, কোরের মধ্যে আরো জমাট বাধা থেকে এবং বস্তুর তেজস্ক্রিয়তা থেকে নির্গত তাপ থেকে। অভ্যন্তরে গলিত শিলার নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাগমা। এই ম্যাগমাই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় বেরিয়ে আসে। তখন তার নাম লাভা।

আমরা পৃথিবীর উপরভাগে তিন রকমের শিলাস্তর পাই। আগ্নেয় শিলা পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ থেকে উদগত বা নির্গত গলিত লাভা-ম্যাগমা থেকে শীতল হয়ে তৈরী হয়। গ্রানাইট ব্যাসল্ট ইত্যাদি আগ্নেয়শিলা। পাললিক শিলা পূর্বতন শিলার (য় থেকে মিহিদানার মতো পলি হিসেবে উৎপন্ন হয়। তারপর স্তরে স্তরে জমে জমাট বেধে কঠিন শিলা হয়ে জন্মায়। এরকম শিলার উৎপত্তির সঙ্গে নদী-সমুদ্র-মহাসাগরের সম্বন্ধ আছে। রূপান্তরিত শিলা হয় আগ্নেয় শিলা বা পাললিক শিলা যখন তাপ-চাপের কাছে দীর্ঘ সময় নতি স্বীকার করে পরিবর্তিত হয়।

এবার আমরা সুনামি কেন হয় বা কিভাবে হয় তা জানার চেষ্টা করব। আসলে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভূকম্পনটা কেন হয় বা কিভাবে হয় সেই প্র(। মাটির গভীর থেকে তপ্ত লাভার যখন স্রোত উঠে আসে, তখন মাটি কাঁপতে থাকে। সেটা না হয় বোঝা গেল। অন্য সময় বিনা অগ্ন্যুৎপাতেও তো মাটি কাঁপে। কেন? আরো দেখা গেল প্রশান্ত মহাসাগর ঘিরে রয়েছে এক প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয়গিরি বলয়। রিং অফ ফায়ার। আরেকটি এমনি বলয় প্রসারিত হয়েছে হিমালয় থেকে তুরস্ক হয়ে আল্পস পর্যন্ত। এই আগুন ওগরানো বলয়ের এরকম অবস্থানের কোন আলাদা তাৎপর্য আছে কি না সেটাও প্র(।

সর্বাধুনিক প্লে-ট-টেকটনিক তত্ত্বের সাহায্যে এখন এসব রহস্যের অনেকটাই সমাধান করা গিয়েছে। তবে আমরা তার আগে আরেকটি চমক-লাগানো তত্ত্বের কথা বলে নেব।

১১। কন্টিনেন্টাল ড্রিফট থিয়োরি

সপ্তদশ শতক থেকে — স্যর ফ্রান্সিস বেকন, কাউন্ট দ্য বুঁফো ও ফ্রাঁসোয়া প্যাগেট — মহাদেশের চলনের কথাটা বলাবলি করছিলেন। বলেছিলেন আরো দুচারজন। ১৮৭৯ সালে চার্লস ডারউইনের ছেলে, স্যর জর্জ ডারউইন, প্রস্তাব রাখেন — সুদূর অতীতে পৃথিবী থেকে চাঁদের জন্ম হয়েছিল হয়তো। পরে রেভারেণ্ড অসবর্ন ফিশার ১৮৮২ এবং ১৮৮৯ সালে বলেন — গভীর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের জন্ম হতে পারে। তারপর মহাসাগরের দুপারের মহাদেশগুলি নিজেদের দিকে এগিয়ে এসে সেই (ত অনেকটা পূরণ করে ফেলেছে। আর আমেরিকার পশ্চিমদিকে সরে আসার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরের। তথ্যগত ভিত্তি মজবুত নয়, তবে মহাদেশ নড়েচড়ে বেরাচ্ছে এমন অবিশ্বাস্য ভাবনা কিন্তু উঠে পড়ল।

এসব কথা যখন বলা হচ্ছিল, তখন পৃথিবীর ম্যান্টল তরল বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ১৯১২ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে জার্মান আবহাওয়াবিদ আলফ্রেড লোথার ওয়েগনার (১৮৮০-১৯৩০) এক বিচিত্র তত্ত্ব, মহাদেশীয় ভাসমান তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। তার নাম হল মহীসঞ্চার প্রকল্প বা কন্টিনেন্টাল ড্রিফট থিয়োরি। না, তিনি আচমকা কল্পনা করে বলেননি। বা বিদ্যুৎচমকের মতো প্রজ্ঞার ঝিলিক খেলে যায়নি মগজে। গত ৩০ বছর ধরে যেসকল তথ্য সামনে এসেছে, সেসবের উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর ভাবনাকে মেলে ধরলেন।

যেমন — ১৯১০ সালে তিনি ল(্য করলেন যে, আটলান্টিকের দুপাড়ের মহাদেশের মধ্যে চমৎকার মিল রয়েছে শিলাস্তরে। যেন এক মহদেশের তটরেখা অন্যটির পরিপূরক। এর সঙ্গে তিনি নানা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং আরো কিছু তথ্য মিলিয়ে দেখলেন যে, তার ঐ পরিপূরক ভাবনার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। ১৯১২ সালে এ বিষয়ে লেকচার দিলেন। তারপর ১৯১৫ সালে একখানি বই লিখে বিশ্ববাসীকে চমকে দিলেন — দ্য অরিজিন অব কন্টিনেন্টস অ্যাণ্ড ওশেন। বললেন — মহাদেশগুলি নিথর ভূখণ্ড নয়, এক একটি সচল ভূখণ্ড। যদি ভূভাগের উপরনিচ চলন থাকতে পারে, তবে তাদের পাশাপাশি চলনও সম্ভব। একদা সব মহাদেশ এক বিশাল মহা-মহাদেশ হয়েছিল। তার নাম রাখা হল প্যানাজিয়া। এবং একটাই মহা-মহাসাগর ছিল — নাম প্যান্থালাসা। পরে প্যানাজিয়া ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। এবং তারা দূরে সরে যায়।

দ(িণ আফ্রিকার অ্যালেক্স দ্য টোল্ট (১৮৭৮-১৯৪৮) ওয়েগনারের এই তত্ত্ব সঠিক বলে মনে করতেন। ওগেনারের মৃত্যুর পরে তিনিও এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন।

তিনি দুটো প্রাচীন মহাদেশের নামকরন করেছিলেন — লরেশিয়া এবং গণ্ডোয়ানা।

চমকপ্রদ হলেও বেশকিছু ভূতত্ত্ববিদ তার প্রস্তাব মেনে নিতে পারছিলেন না। কারণ মহাদেশের চলনশকিত কি করে এল, তার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি তখনো। ভূকম্পীয় ধারণা থেকে

জানা গিয়েছিল যে, পৃথিবীর ম্যান্টল কঠিন অবস্থায় রয়েছে। সে ে ত্রে কঠিন স্তরের উপর দাঁড়ানো মহাদেশগুলি কি করে পাশাপাশি চলতে পারে!

বিশের দশকে জার্মান ভূ-পদার্থবিদ বেনো গুটেনবার্গ (১৮৮৯-১৯৬০) দেখালেন যে, কঠিন ম্যান্টলের সান্দ্রতা (ভিস্কসিটি) অনেক হলেও, কঠিন অবস্থায় থেকে পরিচলন (কনভেকটিভ) প্রবাহ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ। ফলে মহাদেশ সচল থাকলেও থাকতে পারে। যদি পারে, তাহলে ওয়েগনারের মহাদেশীয় চলন-তত্ত্ব সঠিক।

রেডিয়ো-অ্যাক্টিভিটি থেকে শিলার বয়স মাপার এক উপায় আবিষ্কৃত হল ১৯১৩ সালে। উদ্ভাবক বৃটিশ ভূতত্ত্ববিদ আর্থার হোমস (১৮৯০-১৯৬৫)। ১৯২৮ নাগাদ তিনি বললেন - পৃথিবীর ম্যান্টলে তেজসিক্রয় তাপের ফলে গলিত শিলাস্তরে একাধিক পরিচালন স্রোত থাকা সম্ভব। অনেকটা কোষের মতো করে। এবং তা ওয়েগনারের মহাদেশকে সচল রাখতে পারে। দুটি পরস্পরমুখী কোষের মধ্যে স্পর্শটানে শিলামণ্ডল ফুলে উঠতে পারে। উধর্বমুখী পরিচালন স্রোতের নাম দেওয়া হল প্লিউম। মহাদেশ সচল রাখতে এ হল সম্ভাব্য উপায়।

এর পরেও কিন্তু কিছু কিছু ভূতত্ত্ববিদ ওয়েগনারের কথা মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। বিশেষ করে পদার্থবিদ হ্যারল্ড জেফ্রিজ। কিন্তু দ্বিতীয় বি(যুদ্ধের পরে নতুন কিছু আবিষ্কার সবকিছু বদলে দিল। দেখা গেল যে, জলের নিচে সমুদ্রতল সাদামাটা নিরাকার বা বৈচিত্র্যহীন কোন ভূত্বক নয়। অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে সেখানে।

১২। সামুদ্রিক পর্বতমালা

সত্যি কথা বলতে কী, সমুদ্রতলের গঠন সম্পর্কে আধুনিক ধারণার শু(হয়েছিল কিছুদিন আগে। এক সামান্য ঘটনা কেন্দ্র করে। পরে তা থেকে সমুদ্র-প্রসারণের মতো বড়ো ধারণা উঠে এল। ১৮৫০ সালে মার্কিন সাগরবিদ ম্যাথু ফন্টেন মারি (১৮০৬-১৮৭৩) আটলান্টিকের সমুদ্রতল ধরে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে একটি টেলিগ্রাফ লাইন পাতার কাজ করতে গেলেন। ইয়ুকাটান থেকে কেলভার্দে পর্যন্ত কেবল পাততে দীর্ঘ পনেরো বছর সময় লেগেছিল সেকাজটা করতে। এখন সেখানে দু ডজনের মতো লাইন পাতা আছে। মারি তখন জরিপ করতে করতে আবিষ্কার করেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ সমতল নয়(বরঞ্চ তার মাঝখানটা উঁচু পাহাড় হয়ে রয়েছে। সেই পাহাড়ের নাম রাখা হল টেলিগ্রাফ মালভূমি (টেলিগ্রাফ প্ল্যাটো)।

১৯২২ সালে সামুদ্রিক তলদেশ সম্পর্কে অনুসন্ধানের কাজে একো সাউন্ডিং পদ্ধতি লাগানো হল। সম্ভবত জার্মান জাহাজ, মেটিয়র, একাজটা করেছিল আটলান্টিকে। এর ফলে সমুদ্রতলের আরো খবর আবিষ্কৃত হতে লাগল। ১৯২৫ সালের মধ্যে বোঝা গেল যে, মারের ওই টেলিগ্রাফ মালভূমি আসলে গোটা আটলান্টিক মহাসাগর জুড়ে-থাকা সমুদ্রে নিমজ্জিত একটি পর্বতমালা।

আটলান্টিক বরাবর উত্তর থেকে দখিনে বিস্তৃত। আমরা স্থলভাগে যত পর্বতমালা দেখি, তাদের সবার থেকে বড়ো এবং আরো বেশি পরিমাণে এবড়োখেবড়ো সেই সামুদ্রিক পর্বতমালা। তারই উঁচু শৃঙ্গসকল মাথা তুলেছে সমুদ্রজল থেকে — উত্তর আটলান্টিকে অ্যাজোরে, মধ্যে অ্যাসেনশন, দখিনে ত্রিস্তান-দ্য-কুনহা নামে। বিজ্ঞানীরা টেলিগ্রাফ মালভূমির নতুন নামকরণ করলেন, মধ্য অতলান্ত পর্বতমালা (মিড অ্যাটলান্টিক রেঞ্জ)।

ক্রমশ নজরে এল — হাউই দ্বীপপুঞ্জ আসলে ৩৩০০০ ফুট উঁচু পর্বতের শিখরদেশ। ১৯৪৬ সালে মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ, হ্যারি হেমণ্ড হেস (১৯০৬-১৯৬৯) সমুদ্রে এরকম আরো অনেক শঙ্কুর মতো দ্বীপ-খণ্ড পেলেন যার উপরভাগ সমতল। উনি ১৯টি এরকম দ্বীপভূমি খুঁজে পেলেন। এদের নাম রাখা হল সি-মাউন্ট বা গায়োট। পরে এরকম অসংখ্য সি-মাউন্ট পাওয়া গেল।

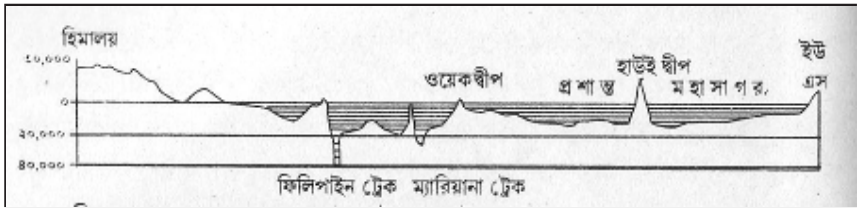

চিত্র-৫ প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ (উচ্চতা ফুটে)

আরো আবিষ্কৃত হল সমুদ্রের বুকে রয়েছে গভীর ট্রেঞ্চ বা খাদ। ২০,০০০ ফুটের বেশি গভীরতা সম্পন্ন সেসকল খাদ। প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইন, ম্যারিয়ানা, কুরাইল, সোলোমোন এবং আলেউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বরাবর এসকল খাদ নজরে এল। আটলান্টিক মহাসাগরে ট্রেঞ্চ দেখা গেল ওয়েস্টইণ্ডিজ এবং সাউথ স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের কাছে। ভারত মহাসাগরে রয়েছে ইস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপাবলির কাছে। আন্দামান-নিকোবর হয়ে জাভা-সুমাত্রা পর্যন্তও একটি খাদ আছে জাভা ট্রেঞ্চ নামে। মজা হল এই খাতে তাপ-প্রবাহ কম। ভিতরটা ভরে আছে পললে। মহাদেশের ধারেকাছে তাদের অবস্থান।

ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে গুটেনবার্গ দেখালেন যে, পৃথিবীর উপর-ম্যান্টলে এক প্রকার নরম শিলাস্তর রয়েছে। পরের বছরে প্যাটার্সন অবাক হয়ে দেখতে পেলেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর তলদেশে অতি সামান্য পু(পলির স্তর রয়েছে। এত কম পলি কেন? মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ উইলিয়াম মরিস ইউং (১৯০৬-১৯৭৪) দেখলেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরের নিচে 'সিয়াল' স্তর বলে কিছু নেই। মহাসাগরীয় ভূত্বক ৫-৮ কিমি গভীর কিন্তু মহাদেশীয় ভূত্বক প্রায় ৪০ কিমি গভীর। এরকম হওয়াটাও এক আশ্চর্যজনক ঘটনা।

আরো অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেল, ঐ মধ্য আটলান্টিক পর্বতমালা আফ্রিকার কাছে বেঁকে ভারত মহাসাগর হয়ে আরব সাগরের দিকে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়েছে

একই রকমের আরেকটি পর্বতমালা — মধ্য ভারত-মহাসাগরীয় রেঞ্জ। ঐ রেঞ্জ অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড ছাড়িয়ে তারপর প্রশান্ত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে উত্তরদিকে উঠে গিয়েছে। এখন আর এদুটি রেঞ্জকে আটলান্টিক বা ভারত মহাসাগরের নামে ডাকার অর্থ রইল না। এর নাম রাখা হল মধ্য মহাসাগরীয় গিরিশিরা (মিড ওশেনিক রিজ)। এর প্রস্তর আগ্নেয় শিলা ব্যাসাল্ট জাতীয় যা কিনা ভূগর্ভের উষ(গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে। প্রতিতুলনায় মহাদেশীয় শিলাপ্রস্তর ভাঁজ-খাওয়া (ফোল্ডেড) পাললিক শিলার।

১৩। সমুদ্রতলের বিস্তার (সি-ফ্লোর স্প্রেডিং)

সমুদ্রে নিমজ্জিত পর্বতমালার আরেক বৈশিষ্ট্য নজরে এল। ১৯৫৩-৫৭ সালে ইউং এবং ব্রুস চার্লস হিজেন (১৯২৪-১৯৭৭) আরো সূক্ষ্মভাবে সমুদ্রতল সাউণ্ডিং করে জানতে পারলেন যে, ঐ গিরিশিরার মাঝ বরাবর একটানা রয়েছে এক গিরিখাত (ক্যানিয়ন)। মধ্য মহাসাগরীয় গিরিশিরার প্রায় সর্বত্র এই গিরিখাতটি প্রলম্বিত দেখা গেল। একে অনেকে গ্রেট গ্লোবাল রিফ্ট্ বলতে লাগলেন।

আরো দেখা গেল যে, ঐ রিফ্ট্ একেবারে লম্বাটে ধরণের ফাটল নয়। এগুলো ছোট ছোট আকারের সোজা ফাটল (ফল্ট)। এক ফাটল থেকে অন্য ফাটল খানিকটা করে সরে গিয়েছে। মনে হবে যেন ভূকম্পনই ফাটলগুলোকে স্থানচ্যুত করে ফেলেছে।

এমনধারা আরো কিছু কিছু আবিষ্কার হল যা থেকে ১৯৬১ সালে রবার্ট স্ক্যামল্জ্ (জন্ম ১৯২৯) এবং হ্যারি হ্যামণ্ড হেস (১৯০৬-১৯৬৯) বললেন যে, পৃথিবীর ম্যান্টল মনে হয় সত্যি সত্যি পরিচলন বা কনভেক্ট করছে। মানে আপাত-কঠিন শিলাস্তরেও একটা প্রবাহধারা (কনভেকশান কারেন্ট) চালু আছে। ১৯২৯ সালেই স্যর আর্থার হোমসও ম্যান্টলে কনভেকটিভ কারেন্ট থাকতে পারে এমন কথা বলেছিলেন। গলিত লাভা মধ্য-সাগরীয় গিরিশিরা বরাবর ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে। ছড়িয়ে পড়ছে গিরিশিরার দুপাশে। শীতল হয়ে গিরিশিরায় জমা হচ্ছে। আবার নতুন করে লাভা উঠে এসে গিরিশিরার দুপাশে জমা হচ্ছে। ফলে আগের লাভা একটুএকটু করে সরে যাচ্ছে গিরিশিরা থেকে। এভাবে গিরিশিরার দুপাশের সমুদ্র-মেঝে গিরিশিরার চূড়ো থেকে দুদিকে একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে কোথায়? অন্য প্রান্তদেশ তখন মহাদেশের নিচে ডুবে যাচ্ছে।

সমুদ্রতলের এই বিস্তার বছরে আনুমানিক ১৬ সেমি হারে। হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে যে, এই হারে সমুদ্রতলের প্রসারণ হলে গোটা প্রশান্ত মহাসাগরের মেঝে মাত্র ১০ কোটি বছরের মধ্যে ঢাকা পড়ে যায়। পৃথিবীর বয়স সে তুলনায় অনেক বেশি — ৪৬০ কোটি বছর। তাই দেখা যাচ্ছে যে, সমুদ্রতলের শিলা মহাদেশীয় শিলার তুলনায় খুব বেশিদিনের পুরোনো নয়। ১৯৬১ সালে রবার্ট ডিয়েজ হেস-প্রস্তাবিত মডেলটিকে সমুদ্রতলের বিস্তার (সি-ফ্লোর স্প্রেডিং) নাম দিলেন।

১৪। প্রত্ন চুম্বকত্ব

পৃথিবী একটি বিশাল চুম্বক। চুম্বকত্বের কারণ ভূগোলকের কোরের গঠন। শলাকা-চুম্বক ঝুলিয়ে রাখলে এটা অবধারিত যে তারা কেবল উত্তর মে(ও দখিন মে(র দিকেই তাকাবে। উত্তর মে((আসলে দখিন চুম্বকীয় মে() বর্তমানে রয়েছে ৭৭.১৮° উঃ এবং ১০১.৪৮° পঃ দ্রাঘিমায় — কানাডার বাথার্স্ট দ্বীপের কাছে। দখিন মে((আসলে উত্তর চুম্বকীয় মে() রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডের দখিনে ৬৫.৪৮° দঃ এবং ১৩৯.৬° পূঃ দ্রাঘিমার সংযোগস্থলে। দুজন বিজ্ঞানী, ওয়াল্টার মরিস এলসাসের (জন্ম ১৯০৪) এবং স্যর এডোয়ার্ড বুলার্ড (১৯০৭-১৯৮০) পৃথকভাবে তা আবিষ্কার করেন।

মজার কথা হল, এই চুম্বকত্ব চিরকাল এমন এক জায়গায় স্থির ছিল না। কখনো কখনো তা অন্যত্র ছিল। তার স্বা'খ'র রেখে গিয়েছিল কিছু শিলাপ্রস্তরে। আমরা একে পুরা-চুম্বকত্ব বা প্রত্ন-চুম্বকত্ব (প্যালিও-ম্যাগ্নেটিজম) বলতে পারি। বর্তমান পৃথিবীর মে(দ্বয়ের অবস্থান ৭,৩০,০০০ বছর আগে নির্ধারিত হয়েছিল। এটি 'ব্রুনেহ কাল' নামে চিহ্নি(ত। পূর্ববর্তী চুম্বকীয় কাল মাতুয়ামা, গস, গিলবার্ট ইত্যাদি নামে চিহ্নি(ত হয়েছে। জাপানের ভূতত্ত্ববিদ মোতোনোরি মাতুয়ামা (১৮৮৪-১৯৫৮) আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীর উত্তর মেরু কখনো দখিন মেরুতে এবং দখিন মেরু উত্তর মেরুতে চলে যায়। একে পারিভাষিক শব্দে 'চৌম্বক ব্যুৎক্রম' (পোলার রিভার্সাল) বলে। আমরা সহজ ভাষায় একে মেরুবদল বলতে পারি।

পঞ্চাশের দশকে হস্পার, ফিশার, ব্ল্যাকেট এবং যাটের দশকে রানকর্ন দখিন আফ্রিকা থেকে পাওয়া শিলা থেকে দেখলেন যে, বিভিন্ন যুগে উত্তর মেরুর সম্ভাব্য বিন্দুটি এক জায়গায় নেই। নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। ওই বিন্দুগুলো যোগ করলে আমরা অতীত-মেরুর সঞ্চার-পথ পাই। সমস্যা হল যে দুটো আলাদা জায়গা থেকে দুটো আলাদা রকমের মেরু-সঞ্চারপথ পাওয়া যাচ্ছে। তারা সমান্তরালও নয়। এটা হওয়া উচিত ছিল না। আরো দেখা গেল যে, কোন বিশেষ কালে দুই সঞ্চারপথের মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে, অন্যকালে সে দূরত্বটা নেই। কম বা বেশি হয়ে পড়েছে। চমৎকার ঘটনা হল এই যে, দখিন আমেরিকা এবং দখিন আফ্রিকা থেকে পাওয়া ৩৫ কোটি বছরের প্রাচীন শিলায় মেরু-সঞ্চার রেখার বিন্দুতে যে দূরত্ব পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মধ্যে দূরত্ব ৫০০০ কিমি। আফ্রিকার আক্রা থেকে দখিন আমেরিকার সাওপাওলোর মধ্যে দূরত্বও ৫০০০ কিমি। শুধু তাই নয়, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ৩৫ কোটি বছরের প্রাচীন মেরুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্বও ৫০০০ কিমি। এসব ঘটনা থেকে মহাদেশের সচল থাকার সমর্থন মেলে।

পুরা-চুম্বকত্ব বা প্যালিও-ম্যাগনেটিজম থেকে ১৯৬২ সালে রানকর্ন দেখলেন যে, উত্তর আমেরিকা ইউরোপের থেকে ২০ ডিগ্রি কোণে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে।

পরের বছর কানাডার ভূতত্ত্ববিদ জন তুজো উইলসন (১৯০৮-১৯৯৩) আবিষ্কার করলেন যে, ম্যান্টলে নির্দিষ্ট লাভাকুণ্ড বা তপ্তকুণ্ড (হট-স্পট) থেকে লাভাস্রোত চলমান ভূত্বক ভেদ

করে বেরিয়ে আসছে। ফলে পরপর একাধিক আগ্নেয়গিরি তৈরী হয়ে যাচ্ছে। এভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে হাউই দ্বীপপুঞ্জ তৈরী হয়েছে। সেখানকার বর্তমান আগ্নেয়গিরির বয়স কম। দূরবর্তী আগ্নেয়দ্বীপের বয়স বেশি। সচল মহাদেশের প্রতি সেও এক সমর্থন। ১৯৬৫ সালে তুজো দিলেন ভূত্বকের ফাটলে 'ট্রান্সফর্ম ফল্ট' সম্পর্কে ধারণা।

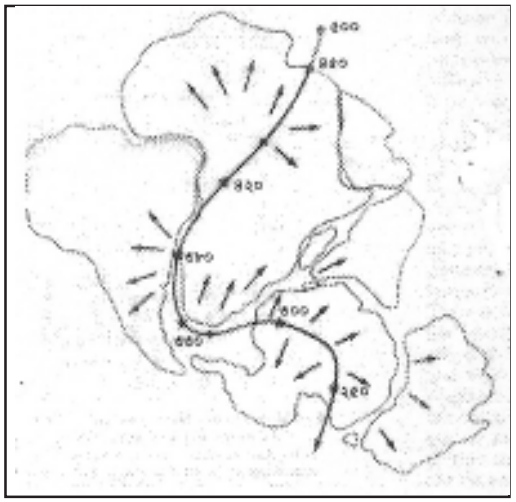

চিত্র-৬। প্যালিওজয়িক অধিযুগে গণ্ডোয়ানায় দখিন মেরুর সঞ্চরণ (কোটিবর্ষের হিসেবে)।

এদিকে ১৯৬৩ সালে বৃটেনের ফ্রেডেরিখ জন ভাইন (জন্ম ১৯৩৯) এবং মাস্টারমশাই ড্রামণ্ড হয়েল ম্যাথুস (জন্ম ১৯৩১) আবিষ্কার করলেন যে, অতীত পৃথিবীর চুম্বকত্ব প্রায়ই দিক-পরিবর্তন করে সমুদ্রতলের ভূত্বকে তার স্বা'খ'র রেখে গিয়েছে। তাই সমুদ্র-তলের চুম্বকত্ব মাঝেমধ্যে কেমন এলোমেলো মনে হয়। ১৯৬৬ সালে হেইর্টজলার, পিচোন এবং ব্যারন আবিষ্কার করলেন যে, আইসল্যাণ্ডের দখিনে আটলান্টিক গিরিশিরার অংশবিশেষ যা রেইকজিন্স রিজ নামে পরিচিত, তার ক্রেস্টের দুপাশে চুম্বক-বিন্যাস আশ্চর্যরকমের এক। গিরিশিরার উপরকার চুম্বকত্ব হাল আমলের (মানে প্রায় ৭ লাখ বছরের)। কিন্তু গিরিশিরার দুপাশের চুম্বকত্ব ২৫ লাখ বছর প্রাচীন(আরেকটু দূরে তা ১ কোটি বছর প্রাচীন।

১৫। প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব

এই সকল তথ্য আবিষ্কারের পরে ১৯৬৭ সালে ড্যান ম্যাকেঞ্জি (জন্ম ১৯৪২) প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব প্রস্তাব করলেন। গ্রীক শব্দ টেকটনিক কথার অর্থ হল — ছুতোর মিস্ত্রি (কার্পেন্টার)। কাঠ-মিস্ত্রিরা বাঁকাচোরা করে কাঠ কেটে যেমন জোড়া দেয় তেমনি করে যেন পৃথিবীর উপরতল একাধিক প্লেটে প্লেটে জোড়া।

বলা হচ্ছে — গুটেনবার্গ-আবিষ্কৃত নরম শিলাস্তরের উপরে পৃথিবীর কঠিন ভূত্বক (লিথোস্ফিয়ার) কয়েকটি প্লেট দ্বারা গঠিত। যেন কড়াই-ভর্তি দুধের উপর যেমন খণ্ড খণ্ড সর

পড়ে। এই সমস্ত প্লেট অনড় অচল নয়, সচল। চলতে চলতে নিজেদের মধ্যে কখনো তাদের ঘর্ষণ হয় (স্লাইডিং), কখনো সোজাসুজি ধাক্কা লাগে (অভিসারী বা কনভারজেন্ট প্লেট)(কখনো বা এক প্লেটের নিচে অন্যটি চেপে বসে (অবনমন বা সাবডাকশন), কখনো মধ্য-সাগরীয় রিজের মতো দুই প্লেট দুদিকে সরে যায় (অপসারী বা ডাইভারজেন্ট প্লেট)।

১৯৭০ সালে আর্থার ম্যাক্সওয়েল ও তাঁর সহকর্মীরা দখিন আটলান্টিকের গভীর সমুদ্রে ড্রিল করে প্লেট টেকটনিক মডেল সঠিক বলে প্রমাণ করলেন। তাঁরা দেখালেন যে, গভীরতম সমুদ্রের পলির বয়স ঠিক তার নিচের ব্যাসাল্ট শিলার বয়সের সঙ্গে মিলে যায়। এবং সেই বয়সটা মধ্য-আটলান্টিক গিরিশিরার থেকে দখিন আমেরিকা মহাদেশের দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকে।

১৬। পৃথিবীর প্লেটের বিন্যাস

এভাবে আমরা ক্রমশ জানতে পারলুম যে, সমগ্র পৃথিবীর উপরিভাগ প্রধান কয়েকটি প্লেটের উপরে মহাদেশ-মহাসাগর বুকে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাঙাচোরা সেসব প্লেটের বিন্যাস বিচিত্র। প্রধান ৮টি প্লেট হল — আফ্রিকা, ইউরেশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত, উত্তর আমেরিকা, দখিন আমেরিকা, কুমে((অ্যান্টার্কটিকা) এবং নাজকা-র প্লেট। আরো কিছু প্লেট আছে — যেমন, কোকো, ক্যারিবিয়ান, সোমালি, আরবীয়, ফিলিপাইন, এবং স্কোটিয়ার প্লেট। রয়েছে কিছু ছোট ছোট মাইনর প্লেট, মাইক্রো প্লেট, প্লেটের ভাঙা টুকরো এবং প্লেটের অবশেষাংশ (যেমন, উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে জুয়ান-দ্য-ফুকা এবং গোর্দা প্লেট, কুলা প্লেটের কিছু টুকরো)। বিষ্ণু(র অনন্তশয্যার মতো যেন এক একটি প্লেট ধীরে খুব ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে অনন্তকাল।

মহাদেশের নিচে প্লেটের গভীরতা ১২০ কিমি এবং সমুদ্রের নিচে ৬৫ কিমি। সবথেকে বড়ো হল প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট(তার প্রস্থ ১২,০০০ কিমি এবং প্রধান প্লেটের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল নাজকা প্লেট(তার প্রস্থ ৩০০০ কিমি। ঐ দুটি প্লেট আবার পুরোপুরি মহাসাগরীয় প্লেট। ইয়োরেশিয় প্লেট সম্পূর্ণ মহাদেশীয় প্লেট, মানে, মহাদেশ বুকে নিয়ে ভাসছে। বাকিরা কিছুটা দেশ-মহাদেশ এবং কিছুটা সাগর-মহাসাগর বুকে নিয়ে আছে।

লিথোস্ফিয়ারের নিচে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার সামান্য গলিত অবস্থায় রয়েছে। তাই সে লিথোস্ফিয়ারের নিচে বসে লুব্রিক্যান্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। এর নিচের ম্যান্টল কঠিন। কিন্তু সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, কঠিন হলেও পুরোপুরি দৃঢ় নয়। এর সান্দ্রতা খুব বেশি তবু অন্যান্য কঠিন বস্তুর মতো ধীরে ধীরে চাপের কাছে নতি স্বীকার করে প্রবাহিত হতে পারে।

দেখা যায় যে, পৃথিবীর ভূমিকম্পগুলো প্রধানত এই সব প্লেটের সীমানা বরাবর ঘটছে।

প্যাসিফিক পে-টের উপরে প্রান্তদেশ বরাবার রয়েছে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, আলাস্কা, ক্যালিফোর্নিয়ার ভূকম্প-প্রবণ এলাকাগুলি। ইউরেশিয়া এবং আফ্রিকা পে-টের ভূমধ্যসাগরীয় সীমানায় রয়েছে অরেক প্রস্থ ভূকম্প-প্রবণ এলাকা।

সমুদ্রের নিচে যে সকল গভীর ফাটল (ফল্ট) দেখা গিয়েছিল সেখানে এক পে-টের শিলাপ্রস্তর মাঝেমাঝে অন্য পে-টের উপর পিছলে যাচ্ছিল। ফলে ভূকম্প হচ্ছিল। এসরকম একটি ফল্ট হল আমেরিকার স্যান অ্যানড্রিয়াস ফল্ট। অবস্থান ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল বরাবর — সানফ্রান্সিসকো থেকে লস-এঞ্জেলস পর্যন্ত। আসলে সেটা আমেরিকার এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় পে-টের সীমানার উপর।

এখন ভূকম্পনের হিসেবটা মিলছে। ওয়েগেনারের মহাদেশের চলনটা সত্যি। তবে অন্য ভাবে। মহাদেশ চলছে না। তারা পে-টের উপর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন। পে-ট চলমান, মহাসাগরও চলমান। ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি পে-ট সীমানা ধরে অবস্থান করছে। স্লাইডিং বা কনভারজেন্ট পে-ট হলেই তা ভূকম্পণ প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। যেখানে ফল্টলাইন আছে এবং অবনমন বা সাবডাকশন হচ্ছে সেখানেই কম্পন হতে পারে।

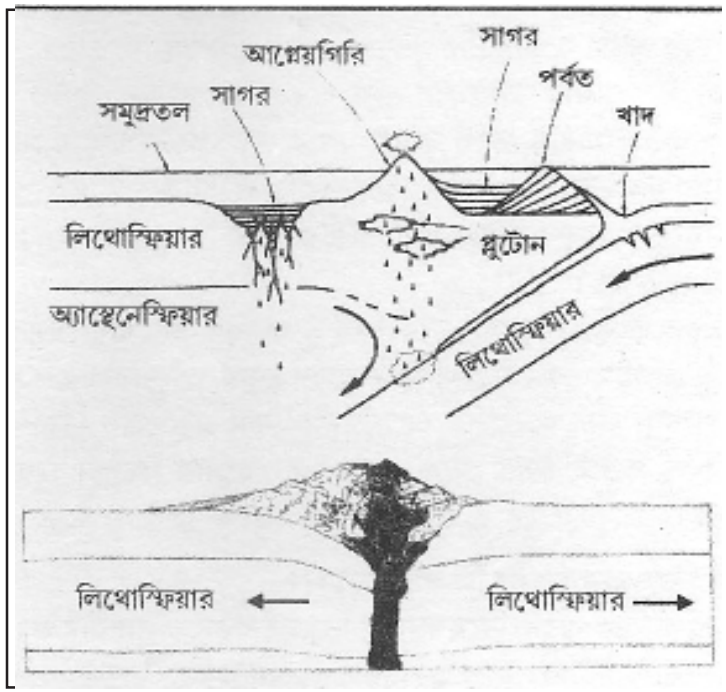

চিত্র - ৭। উপরে অভিসারী ও নিচে অপসারী পে-ট

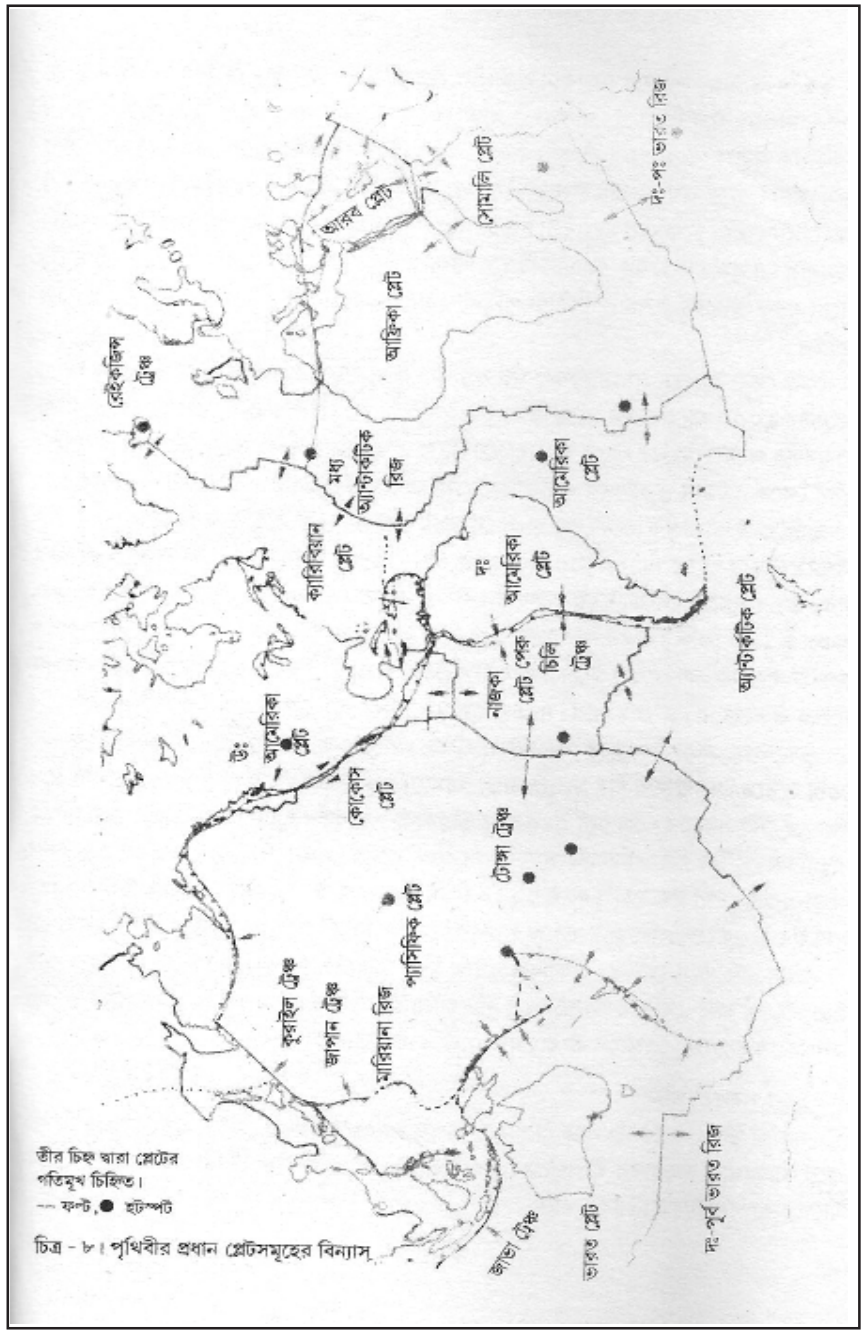

চিত্র - ৮। পৃথিবীর প্রধান প্লেটসমূহের বিন্যাস

শুধু তাই নয়, একটা পে-ট অন্য পে-টের নিচে চলে গেলে, নিচের পে-টের শিলাপ্রস্তর গলিত হয়ে যাচ্ছে। আর ডাইভারজেন্ট পে-টের ফাটল বা গিরিশিরা থেকে ভিতরের গলিত ম্যাগমা উপরে উঠে আসছে। এভাবে ভূত্বকে শিলাও এক চত্রে(র মধ্য দিয়ে পুনরাবির্ভূত হচ্ছে। যাকে রিসাইক্লিং বলতে পারি আমরা। জগত সত্যি চত্র(বৎ পরিবর্তন্তে।

১৭। মহাদেশের গঠন

ভূতত্ত্ববিদগণ এখন বুঝতে পারছেন কিভাবে ২০ কোটি বছর আগে প্যানাজিয়া ভেঙে মহাদেশগুলি গঠন করেছে। ৫৪ কোটি বছর আগে থেকে দখিন গোলার্ধে টুকরো টুকরো ভূখণ্ডগুলি এক জায়গায় জড়ো হয়ে পড়েছিল। তৈরী করেছিল একটিমাত্র মহা-মহাদেশ, উত্তর থেকে দখিন মে(পর্যন্ত বিস্তৃতি ছিল তার। এবং অবশিষ্ট পৃথিবীতে একটিমাত্র মহা-মহাসাগর হয়েছিল — প্যান্থালাসা। প্রথমে ঐ প্যানাজিয়া দু'টুকরো হয়ে দুটি ভূখণ্ড গঠন করেছে। উত্তরে লরেশিয়া (উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া নিয়ে) এবং দখিনে গণ্ডোয়ানা (দখিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং অ্যান্টার্কটিকা নিয়ে)। দুয়ের মধ্যিখানে তৈরী হল টেথিস সাগর। ভূখণ্ডগুলি মোটামুটি উত্তর দিকে সরছিল। ২০ কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকা ইউরেশিয়া থেকে সরে যেতে থাকে। ১৫ কোটি বছর আগে আফ্রিকা থেকে সরে যেতে থাকে দখিন আমেরিকা। আর দুই আমেরিকা এবং ইউরোপ-আফ্রিকার মাঝখানে গঠিত হতে থাকে আটলান্টিক মহাসাগর।

১১ কোটি বছর আগে গণ্ডোয়ানার পূর্বভাগ ভেঙে মাদাগাস্কার, ভারত, অ্যান্টার্কটিকা এবং অস্ট্রেলিয়া হল। মাদাগাস্কার আফ্রিকার সঙ্গে রয়ে গেল। ভারত ৫৫০০ মাইল উত্তরে ছুটে এসে এশিয়ার দখিন সীমানায় চেপে বসল। তখন দুই পে-টের ধাক্কায় গড়ে উঠল হিমালয় পর্বতমালা, পামির মালভূমি এবং তিব্বত উপত্যকা। অ্যান্টার্কটিকা এবং অস্ট্রেলিয়া বোধ হয় ৪ কোটি বছর আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। অ্যান্টার্কটিকা সরে গিয়েছে দখিনে। অস্ট্রেলিয়া আজো উত্তর দিকে ভেসে চলেছে।

পে-ট টেকটনিক তত্ত্বের সাহায্যে আরো কিছু ভূ-তাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক রহস্য উদঘাটিত হল। যেমন, মধ্য এশিয়ায় কেন এত খনিজ তেলের প্রাচুর্য, আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে কেন এত মিনারেল পাওয়া যায়, বা কেবল অস্ট্রেলিয়ায় কেন এত বেশি মার্সুপিয়াল প্রাণী মেলে, এরকম আরো কিছু প্র্নের উত্তর মেলে।

১৮। ২৬শে ডিসেম্বরে ভূত্বকে কি ঘটনা ঘটল?

এই ভূ-তাত্ত্বিক ধারণা নিয়ে আমরা সহজেই বর্তমান সুনামির উৎপত্তি সঠিকভাবে জানতে পারব। প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুধাবন করতে পারব।

ভারত ও বঙ্গোপসাগর রয়েছে ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ার পে-টের উপর। তার উত্তরে ইউরেশিয়ান পে-ট এবং পশ্চিমে প্যাসিফিক পে-ট। ঐ তিন পে-টের মাঝখানে বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে প্রবল চাপের মধ্যে। আমরা বলি তাকে 'আন্তর্জাতিক চাপ-বলয়' মানে কম্প্রেশন বেল্ট। ইউরোপের পর্বত মালা, হিমালয়, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসকল এই বেল্টের মধ্যে পড়ে।

এখানে রয়েছে ভাঙাচোরা টুকরো-টাকরা আরো ছোট ছোট পে-ট। যেমন একটির নাম বার্মা পে-ট। এটি মাইত্রে(া পে-ট। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একাংশ সুমাত্রা ইত্যাদির অবস্থান এই পে-টের উপর। তার পুবপাশে সুন্দা পে-ট।

গত ২০০ বছর ধরে পুবের ইণ্ডিয়ান পে-ট (ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ান পে-ট) এবং পশ্চিমের বার্মা পে-টের মধ্যে নাকি টানাপোড়েন চলছিল। বার্মা পে-ট বছরে ১.৫ সেমি করে পশ্চিমে সরে যেতে চেষ্টা করছিল। ইণ্ডিয়া পে-ট একদিকে উত্তরের তিব্বতের পে-টকে উত্তরের দিকে ঠেলছে আর অন্যদিকে পে-টের পূর্বভাগ বার্মা পে-টের নিচে বসে যাচ্ছে। বসে যাওয়া ইণ্ডিয়া পে-ট ৫০ কিমি থেকে ১০০ কিমি নিচে গিয়ে আত্মবিসর্জন দিচ্ছে। মানে গলিত হচ্ছে। ইণ্ডিয়া পে-ট যে গতিতে তিব্বতকে ঠেলছিল তার চেয়ে বেশি গতিতে ধাক্কা দিচ্ছিল বার্মা পে-টে। এই ধাক্কাধাক্কির ফল এবারের ভূকম্পন।

১৭৯৭ সালে ৮.২ মাত্রার ভূকম্পন হয়েছিল সুমাত্রায়। তারপর হয়েছে ১৮৩৩ সালে যার মাত্রা ৮.৭। এর পরে ঐ এলাকায় তেমন বড়ো ধরণের ভূকম্প হয়নি ছোটখাটো কম্পনগুলোকে পাত্তা দেওয়া হয়নি।

২৬শে ডিসেম্বর সকালে ভূকম্পন কালান্তক চেহারা নিল। ইণ্ডিয়ান পে-ট নাকি এক ঝটকায় বেশ খানিকটা বসে গিয়েছে পশ্চিমের বার্মা পে-টের নিচে। বলা হচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান পে-টে টেকটনিক মুভমেন্টের জন্যে কাঁপুনি লাগে। বার্মা পে-টের উপর থেকে চাপ সরে যায় আর তখন ঝটকা মেরে বার্মা পে-টটি উপরে ঠেলে ওঠে। ফল্টলাইন বরাবর। তখন ইণ্ডিয়ান পে-টটি বার্মা পে-টের নিচে ঢুকে যায় অনেকটা। এই পিছলে বসে যাওয়ার ঘটনা পরপর তিনবার ঘটে। প্রথমবার হয় সুমাত্রার উত্তর কোণার কিছুটা পশ্চিমে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অন্য দুটি ঘটে। আরো একটু উত্তরে। 'নেচার' বিজ্ঞান পত্রিকায় এরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভূবিজ্ঞানী মাইকেল হপকিন।

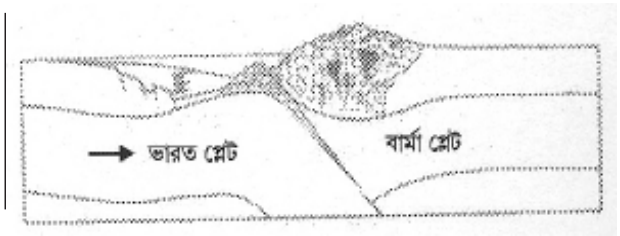

চিত্র-৯। সুমাত্রা ভূমিকম্পে ভারত পে-টের অবনমন।

কেউ কেউ বলছেন সুমাত্রা ভূকম্পের সম্ভাবনা বা পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছিল কিছুদিন আগে থেকেই। ২০০০ সালের জুন মাসে সিঙ্গাপুরে ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়। রিখটার স্কেলে মাত্রা ৭। দুবছর পরে সুমাত্রার কাছে সিমেয়ুলুয়ে দ্বীপে ৭.৪ মাত্রার ভূকম্পন ল'খ্য করা গিয়েছে। এসব থেকে বর্তমান ভূকম্পের পূর্বাভাষ পাওয়া যেত যদি সে পরিমাণ অনুসন্ধান করা হত।

ফলে সেই কালান্তক দিনে দেখা গেল যে, বার্মা প্লে-ট ঠেলে উঠেছে উপরের দিকে। খানিকটা পশ্চিমেও সরে যেতে পারে। আর বিপজ্জনকভাবে ১২০০ কিমি লম্বা ফাটল ধরেছে ধরিত্রীর বুকে। উত্তর সুমাত্রা থেকে উত্তর আন্দামান পর্যন্ত বিস্তৃত সেই ফাটল। প্রস্থে কোথাও ৫০ কোথাও ১০০ কিমি পর্যন্ত। প্রথম কম্পনের ১০০ সেকেণ্ডের মধ্যেই নাকি চিড় ধরেছিল। পরের কম্পনের ১০০ সেকেণ্ডের মধ্যে দীর্ঘ ফাটল তৈরী হয়েছে। পরে আরো ৮০টি কম্পন হয়েছে ঐ অঞ্চলে। ৪-৬ মাত্রার। ৪-এর কম মাত্রার কম্পন হয়েছে বোধহয় লাখের বেশি।

ভূকম্পের এমন বিশালত্বে বিজ্ঞানীরা বিস্মিত। বিশেষ করে সমুদ্রের নিচে এতবড়ো ফাটল তৈরী হয়েছে যে, ভাবাই যায় না। আসলে আমাদের ভূ-বিজ্ঞান যবে থেকে অনুসন্ধান করতে শিখেছে সেই সময়ের মধ্যে তো এমন করে ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন হয়নি। তাই বিজ্ঞানীদের বিস্ময় স্বাভাবিক। বৃটিশ জিয়লজিকাল সার্ভের গবেষক রজার মেসন জানান — এতবড়ো ভূকম্প বড়ো একটা দেখা যায় না। ভূপৃষ্ঠে ১২০০ কিমি দীর্ঘ ফাটল হয়েছে! সুমাত্রার উত্তরাংশে পশ্চিম উপকূলে পরপর তিনবার তিন প্লে-টের মধ্যে স্থান পরিবর্তন হয়।

এখন একদিকে প্লে-টের একাধিক ঝটকা দিয়ে উপরে ওঠা অন্যদিকে ফাটল থেকে ওঠা উচ্চ চাপের জল বেরিয়ে আসা — এই দুটি ঘটনা মিলে সমুদ্রে এমন বিশাল মাপের সুনামির জন্ম সম্ভব হয়েছে। অনেকে একে মেগা-সুনামি বলতে চাইছেন।

১৭। পরবর্তী ঘটনা

সুমাত্রা ভূকম্পের পরে পরে মাঝেমাঝেই ছোট মাত্রার কম্পন টের পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। এবং অন্যত্র। আসলে বড়ো ভূমিকম্পের পরে ছোট মাপের কম্পন প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা।

সোমবার সকালে উত্তর আন্দামানে ভূমিকম্প হল। তার মাত্রা ৬.৪ রিখটার স্কেলে। ভয়ঙ্কর সুমাত্রা-ভূমিকম্পের পরে, ভূকম্প-পরবর্তী কম্পন সেটা। প্রবল প্রথম কম্পনে সুমাত্রা থেকে উত্তর আন্দামান পর্যন্ত দীর্ঘ ফাটল হয়েছে। ওই ফাটলের ধারে নতুন করে ছোটখাট ভাঙন চলতে থাকবে যত'খ'ণ না অবস্থা স্থিতিশীল হয়। তবে তাতে নতুন করে সুনামির সম্ভাবনা নেই। রিখটার স্কেলে ৮এর বেশি কম্পন হলে তবেই সুনামির সৃষ্টি হতে পারে। ভারতীয় ভূ-তত্ত্ব বিভাগের ভূকম্প-বিশেষজ্ঞ ডাঃ জ্ঞানরঞ্জন কয়াল একথা জানিয়েছেন। সোমবার বিকেল পর্যন্ত ২৮টি কম্পন দেখা গিয়েছে। কো লকাতায়ও ১২টি কম্পন ধরা পড়েছে যন্ত্রে।

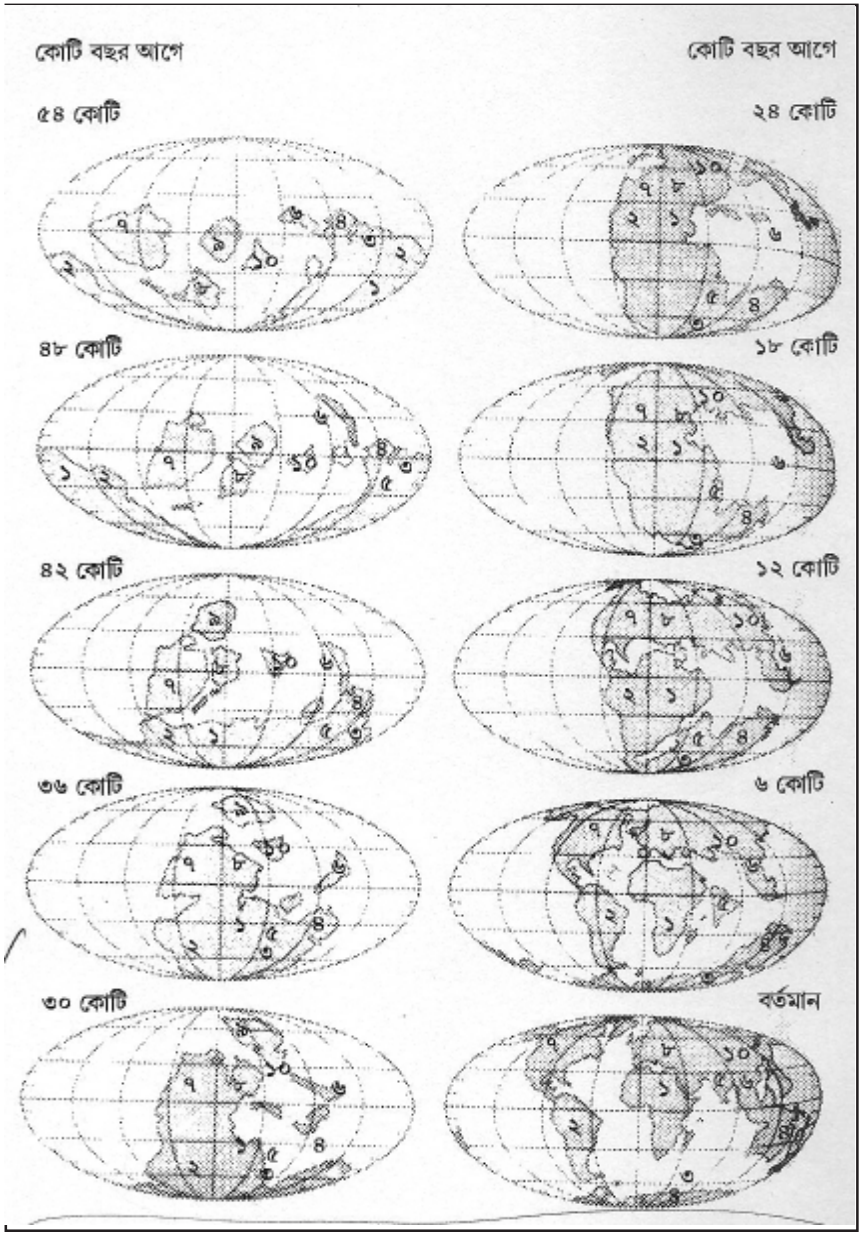

চিত্র -১০। ৫৪ কোটি বছরে মহাদেশের বিবর্তন (১-আফ্রিকা, ২-দঃ আমেরিকা, ৩-অ্যান্টার্কটিকা, ৪-অস্ট্রেলিয়া, ৫-ভারত, ৫-চিন, ৭-উঃ আমেরিকা, ৮-ইউরোপ, ৯ ও ১০-সাইবেরিয়া)।

চারদিন পরে ৩০শে ডিসেম্বরে মায়ানমারে একটি ৫-মাত্রার বড়ো কম্পন ধরা পড়েছে। সেটা সুমাত্রা ভূমিকম্পের পরিবর্ত-কম্পন না, পৃথক কোন কম্পন তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতবিরোধ রয়েছে। জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর আর্থ-অবজার্ভিং অ্যাণ্ড স্পেস রিসার্চের ভূ-পদার্থবিদ রমেশপ্রসাদ সিংহ বলেছেন — পরবর্তী-কম্পন উত্তরদিকে সরে গেলে আসামে বিপদের সম্ভাবনা। জি-এস-আইর ডঃ কয়াল সেকথা মানতে রাজি নন। তাঁর মতে মায়ানমারের কম্পন পৃথক ব্যাপার।

একদল মার্কিন বিজ্ঞানী বলছেন — প্রধান ভূকম্প সুমাত্রার ছোট ছোট দ্বীপগুলিকে দখিন-পশ্চিমে সরিয়ে দিয়েছে। সুমাত্রাও ২০-২৫ ফুট সরে গিয়েছে।

অন্য দল বলছেন — এই নড়াচড়া ওভাবে হয়নি। পাশের দিকে না সরে উপরের দিকে উঠে বসেছে।

১৮৯৭ সালের শিলঙের ভূকম্প কত রিখটার স্কেলের হয়েছিল তা জানা নেই। তবে খাসি পাহাড়ে ফাটল ধরেছিল ৩৫ ফুট চওড়ার। সরে গিয়েছিল খাসি পাহাড়ের পাথরের স্তর। এরকম ঘটনাকে গ্রাউণ্ড ডিসপে-সমেন্ট বলে। সুমাত্রা-ভূকম্পের মাত্রা শিলঙের থেকে অনেক বেশি। ফলে সেখানে এরকম গ্রাউণ্ড ডিসপে-সমেন্ট হয়ে থাকতেই পারে।

মার্কিন ভূতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞ, কেন হাডনাট, বলেছেন — সুমাত্রার দখিন-পশ্চিমের দ্বীপসকল অন্তত ২০ ফুট সরে গিয়েছে।

কলরাডোর ন্যাশনাল আর্থকোয়েক সেন্টারের স্টুয়ার্ট হপকিন্স বলেছেন — সুমাত্রার দ্বীপগুলি পাশে সরে যায়নি, উপরে উঠে এসেছে।

ডাঃ জ্ঞানরঞ্জন কয়ালও বলেছেন — ইণ্ডিয়ান ওসেনিক প্লে-টটি কয়েক হাজার বছর ধরে দখিন-পূর্ব এশিয়ান প্লে-টের নিচে বসে যাচ্ছে। বছরে ৬ সেমি করে। মনে হচ্ছে, ধারাবাহিক এই প্রক্রি(য়ায় মধ্যে হঠাৎ কোন বিপত্তি ঘটেছে। তৈরী হয়েছে ফাটল। এক স্তর লাফিয়ে উঠেছে বা অন্য স্তর বসে গিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে জলের মধ্যে আলোড়ন তথা সুনামি।

লন্ডন বি(বিদ্যালয়ের ভূপদার্থবিদ, বিল ম্যাকগুয়ার, নেচার পত্রিকায় লিখেছেন — সুমাত্রার অবস্থানও বদলে গিয়েছে এবং অসমানভাবে। বান্দা-আচে দ্বীপটি সমুদ্রতলে ডুবে গিয়েছে। কিছু দ্বীপ উপরে উঠে এসেছে। কিছু দ্বীপ সরে গিয়েছে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপও হয়তো খানিকটা উপরে উঠে এসেছে। ভারত মহাসাগরের তলদেশ ১৫ মি সরে গিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার দিকে। নানা কথা উঠছে এমনতরো।

আফ্রিকা-সংলগ্ন ভারত মহাসাগরের ভূস্তর অনেক পুরোনো ও কঠিন বলে তার বেশি 'খ'তি হয়নি। বেশি 'খ'তি হয়েছে বঙ্গোপসাগরের ভূস্তরের। কারণ সেটি তুলনায় নতুন।

নাসার বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন — সুমাত্রা ভূকম্পের পরে পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতিবেগ বেড়ে গিয়েছে প্রতি সেকেণ্ডে ১০ লাখ ভাগের কিছু বেশি। ফলে দিনের সময় কমেছে তিন মাইক্রো(সেকেণ্ড। পরিমাণ সামান্য হলেও সময় তো কমে গিয়েছে। তবে তাতে আবহাওয়ার

কোন বিশেষ পরিবর্তন হবে বলে মনে হচ্ছে না। ঘড়ির কাঁটা বদলানোরও কোন দরকার নেই। তবে জ্যোতিষীরা নাকি খুব সমস্যায় পড়বেন।

পৃথিবীর উত্তর মে(সরে এসেছে বলে নাসার জেট প্রোপালসন ল্যাবের রিচার্ড গ্রস এবং স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের বেঞ্জামিন ফং চাও দাবী করেছেন। দ্রাঘিমা রেখার ১৪৫ ডিগ্রি পূর্ব বরাবর ১ ইঞ্চি সরেছে। এর ফলে পৃথিবীর নির'খ'রেখা বরাবর স্ফীতিও কমেছে। তবে তার পরিমাণ ১০০০ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র।

অস্ট্রেলিয়ার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন — পৃথিবীর অখে' কাঁপন ধরেছে সুমাত্রার ভূকম্পে। সে কাঁপন থামেনি। অভিকর্ষ পর্যবে'খ'নকারী যন্ত্রে তা ধরা পড়েছে বলে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীদের দাবী।

ভূকম্পন-পরবর্তী কম্পন চলছেই। কবে যে ধরিত্রী কিছুটা শান্ত হবে কে জানে!

৩১শে ডিম্বেরের খবর ১৩৫ কিমি দূরের ব্যারন আগ্নেয়গিরি থেকে লাভাস্রোত গড়িয়ে পড়ছে। ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালের উদগীরণের পরে অগ্নিদেবের আবার জেগে ওঠা। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি নারাকোণ্ডাম অবশ্য এখনো ঘুমিয়ে রয়েছে।

৯ই জানুয়ারী রাত ১০-৫১ মিনিটে ভূকম্পন ধরা পড়ল আচেতে। রিখটার স্কেলে মাত্রা — ৬.২। ১১ই জানুয়ারী স্থানীয় সময় ভোর ৫-১৩ মিনিটে ৬.২ মাত্রার কম্পন ধরা পড়েছে বান্দা আচেতে। বঙ্গোপসাগরের ১৪ কিমি ভিতরে তার উৎস।

আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে আসাম। শিলং মালভূমির কাছে ডাউকি লাইন ভূকম্প-প্রবণ এলাকা। যে কোন সময় বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। ভার্জিনিয়া জর্জ মেসন বি(বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী রমেশপ্রসাদ সিংহ এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। দিল্লির ভূকম্প পর্যবে'খ'ণ কেন্দ্রের অধিকর্তা বৈদ্য সব রকমের সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন। আসামে কম্পন হলে তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ ও কোলকাতায় পড়বে।

উপগ্রহ-ক্যামেরা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আন্দামান-নিকোবরে তটরেখায় প্রচুর পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। ত্রিঙ্কাট আর কার নিকোবরের ছবি থেকে পরিষ্কার। নিকোবরের কাছাল দ্বীপে জল ঢুকে দ্বীপটিকে ভাগ করে ফেলেছে। জল ঢুকে পড়েছে অনেকটা ভিতরে। জল নামছে না।

জি-এস-আই মেরিন বিভাগ সমুদ্রতলের নতুন মানচিত্র তৈরী করবে। তারা দ্বীপভূমিতে সূক্ষ্ম কম্পন মাপার যন্ত্র বসাবে 'খয়'খতির পরিমাণ জানতে এবং ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন কি হয়েছে সেটা বুঝতে। ডাঃ কয়াল আরো জানিয়েছেন — এরকম বড়ো মাপের ভূকম্পের পরে সাধারণভাবে ৫০০ বছরে বড়ো ধরণের কিছু ঘটে না।

শোনা যাচ্ছে, মালাক্কা প্রণালীতে জলের গভীরতা ছিল ৪০০০ ফুট হ্রাস পেয়েছে। জাহাজ চলাচলের পথে বিঘ্ন উপস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকোনায় মুকুন্দর বাঁধ ভেঙেছে সুমাত্রা ভূকম্পের পরে। গত ২০শে জানুয়ারী নিকোবরে একদিন দশবার ভূকম্পন হয়। কয়েকটির কম্পনমাত্রা ৫-এর বেশি। ভাবা পরমাণু কেন্দ্র (বার্ক) এবং আইআইটির আর্থ-সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপকগণ

মনে করেন — এসকল কম্পন শুধু ভূকম্প-পরবর্তী কম্পন নয়। ব্যাপারটা উদ্বেগজনক। ডঃ কয়াল অবশ্য তেমন ভয়ের বলে মনে করেন না। তবে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী সমুদ্রজলের রাসায়নিক পরিবর্তন চিন্তাজনক হয়ে উঠেছে। ফাটল থেকে খনিজ পদার্থ উঠে আসছে। বাতাসে নাকি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। নাসা উপগ্রহ 'আইকনস' মারফৎ চিত্র বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন যে, সমুদ্রের অনেক দূর পর্যন্ত জলে ক্লোরোফিলের পরিমাণ বেশ কম। এর ফলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ হ্রাস পাবে। খাদ্যশৃঙ্খল বিপর্যস্ত হবে এবং সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাবে। পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে কতটা সমস্যার সৃষ্টি করবে তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

২০। প্রতিরোধ-প্রতিকার

ভূকম্প বা সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্বিপাক অনেক প্রাণনাশের কারণ হয়। পার্থিব প্রকৃতির তাণ্ডবের কাছে প্রকৃতির একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ আজও অসহায়। তাণ্ডব রোধ করার সামর্থ্য নেই তার। তবে আগাম বার্তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর আছে তথ্য আদানপ্রদানের বন্দোবস্ত করে দ্রুত বিপর্যয় লাঘব করার ব্যবস্থা গ্রহণ। এবং বিপর্যয় হলে, মানুষকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা।

পূর্বাভাষ ঃ কম্পনের উৎস সম্পর্কে আগাম তথ্যের জন্য ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রয়োজন। এবং তা আন্তর্জাতিক স্তরে। প্লে-টের অবস্থান, চলন, ফল্ট লাইনের গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও প্রযুক্তি(অত্যন্ত সীমিত।

তিনটি বিষয়ের উপর সুনামির ভয়াবহতা নির্ভর করে — (১) ভূকম্পের ধরণ, (২) ভূত্বকের কম্পন বা সরে যাওয়ার জন্যে কতটা জলভার স্থানচ্যুত হল, আর (৩) সমুদ্রতলের চেহারা (টোপোগ্রাফি) কেমন। তৃতীয় বিষয়টি বিশেষভাবে জ(রী কারণ তা সুনামির আঘাত করার 'খ'মতার উপর বড়ো প্রভাব ফেলে।

ভূকম্পনের মতো সুনামির পূর্বাভাষ পেতে ভারতে আরো যন্ত্রপাতি দরকার। গোয়ার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ওশেনোগ্রাফির ডাইরেক্টর, সতীশ শেঠি এবং ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলিজির সেক্রেটারি বালাঙ্গিমান রামমূর্তি জানাচ্ছেন — প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ভারত ১০/১২টি ডিপ ওশেন রিপোর্টিং সিস্টেম কিনবে। সমুদ্রের তলদেশে ৩০০০ মি নিচে প্রেসার সেন্সার বসানো থাকবে। তা জলের চাপের পরিবর্তন রেকর্ড করবে। জানাবে সমুদ্রে ভাসমান বয়ার গ্রাহক যন্ত্রে। সেখান থেকে উপগ্রহ মারফৎ খবর যাবে উপকূলের মূল কেন্দ্রে যেখানে সুনামি ওয়াচ কন্ট্রোল সেন্টার বসবে। তারপর হবে তথ্য বি(-ষণ — সম্ভাব্য আঘাতের জায়গাটা কোথায় তা জানা যাবে। কেনা হবে উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিসংখ্যান ঘাটার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি(। তথ্য বিনিময়ের জন্যে যুক্ত(হবে জাভা, সুমাত্রা, মায়ানমার ও

মালয়েশিয়ার সঙ্গে। ইতিমধ্যে দরকার দেশের উপকূল ও সাগরের টোপোগ্রাফিক সার্ভে করা, যে প্লে-টের উপর দেশের অবস্থান তার ফল্টলাইন চিহ্নি(ত করে নজর রাখা।

ভূকম্পের পূর্বাভাষ পেতে প্রাণীদের আচরণ অনুসন্ধান করে তথ্যপ্রযুক্তি(তৈরী করতে চীন গবেষণা করছে। ভারতেও ল(্য করা গিয়েছে কুড্ডালোরে গবাদি পশুদের বেঁধে রাখা হয় না বলে তারা অধিকাংশ পালিয়ে বেঁচেছে। কুড্ডালোরের কেঝুপুত্তুপাতি অঞ্চলে হোলি ফ্যামিলি চার্চের ফাদার সম্পত জানিয়েছেন — তার একটি ল্যাব্রাডার ও দুটি টেরিয়ার কুকুর গীর্জার চত্বরে ঘুরে বেড়াত। সকাল ৮টায় প্রথম তুফান এল, ৯টা নাগাদ আরো বড়ো তুফান। কুকুরগুলো তখন খুব ডাকছিল। এরকম সহজ প্রক্রিয়ায় পূর্বাভাষ পাওয়া সম্ভব কিনা তাও পরখ করা দরকার।

প্রতিরোধ ঃ দেখা যাচ্ছে ম্যানগ্রোভ, ক্যাসুরিনা বাগিচা, প্রবাল প্রাচীর ইত্যাদি প্রবল জলোচ্ছ্বাস প্রতিহত করতে পারে অনেকটা। যেমন তামিলনাড়ুর মুথুভরম ও মুথুপেট এলাকায় ম্যানগ্রোভের জঙ্গল থাকার জন্য স্থানীয় মানুষ প্রলয় দানবের হাত থেকে অনেকটা র'খ'া পেয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে গ্রেট আন্দামান, লিটল আন্দামান ও সেন্টিনেলিজ দ্বীপের বেলায়। বিপরীতে থাইল্যাণ্ডের ফুকেট দ্বীপে অরণ্য ধ্বংস করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে বলে সেখানে ধ্বংসের প্রকোপ বেশি। তাই অরণ্য ধ্বংস করা 'খ'তিকর। সংর'খ'ণে সাইক্লোনের প্রকোপও কমে।

সমুদ্রজলে নিমজ্জিত প্রবাল প্রাচীর অনেকটা বাঁচিয়েছে পোর্ট ব্লেয়ার ও মালদ্বীপের আর্চিপেলাগো এলাকা। বৃটেনের সাউদাম্পটন বি(বিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী দুগ ম্যাসন, ডব্লু ডব্লু এফ ইন্টারন্যাশনালের সমুদ্রবিজ্ঞান দপ্তরের অধিকর্তা সাইমন ক্রিপস, বিশ্ব সংর'খ'ণ ইউনিয়ন (আই ইউ সি এন) এর মুখ্য বিজ্ঞানী জেফ ম্যাকনিলি এবং ভারত সরকারের ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের অধিকর্তা সুব্রত ঘোষাল-চৌধুরি সকলেই ম্যানগ্রোভ ও প্রবাল প্রাচীরের গু(ত্বের কথা জোর দিয়ে বলেছেন।

উপকূল-নির্ভর মানুষের বসবাস ও পর্যটনকেন্দ্রের জন্য হোটেল ইত্যাদি সমুদ্রতট থেকে একটু দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞান ও অবহেলা। পরিবেশ-সচেতন হয়ে মানুষ কিছুটা পরিমাণে অবস্থার নিয়ন্ত্রণ করতে স'খ'ম। যেমন, গ্লে-াবাল ওয়ার্মিং নিয়ে অনেক কিছু করা যেতে পারে। তা ভূমিকম্প-সুনামি প্রতিহত না করতে পারলেও ঝড় সাইক্লোনের মতো ঘটনার প্রাদুর্ভাব কমাতে পারে। স্বাভাবিক উত্তাপ-বৃষ্টিপাতের আবহাওয়া বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। আসলে সাময়িক লাভের জন্যে আমরা হরবখৎ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলছি। সেকারণে দুর্যোগের কারণ অনেকটা আমরাই, আমাদের সভ্যতা। আমাদের অন্ধবিশ্বাস ও উদাসীনতা। দুর্যোগের তৎপরতা পরবর্তী কালে উবে যায়। এই প্রবণতা ভয়ঙ্কর। সচেতন হলে প্রাকৃতিক

দুর্বিপাক সম্পূর্ণ এড়াতে পারব না তবে গ্রহটিকে আরো বেশি কিছুদিন বাসযোগ্য করে রাখতে অবশ্যই পারব। কিছু মানুষের সীমাহীন লোভ ও ভোগবাসনা, রাষ্ট্র-সমাজ-ব্যক্তি(র ল'খ'্যহীন যাত্রাপথ শেষ পর্যন্ত সকলেরই কাল হয়ে দাঁড়াবে, তা মানুষ যত দ্রুত বুঝতে পারে ততই মঙ্গল। সবকিছু জেনেও মানুষ কি তা পারবে?

দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঃ যে কোন দুর্বিপাক সামাল দিতে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক তহবিল তৈরী করা, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ তৈরী করা এবং বিশেষ শি'খ'াপ্রাপ্ত কর্মীদল তৈরী করা প্রয়োজন। দ্রুত উপদ্রুত অঞ্চলে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে এবং প্রয়োজন মতো আশ্রয় শিবিরের ব্যবস্থা থাকবে। তারা দুর্গতদের উদ্ধার করা থেকে শু(করে মৃতদের সৎকার করা, দুর্গত মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ, জল, খাদ্য, চিকিৎসা, সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থাদি করবেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পথঘাট সেতু বিদ্যুৎ টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করবেন। জ(রী ভিত্তিতে ভাঙা পথঘাট সেতু রেলপথ, বিমানবন্দর মেরামত করবেন। মহামারির প্রকোপ থেকে র'খ'ার ব্যবস্থা করবেন।

ত্রাণ সাহায্য ঃ বি(্বজুড়ে মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কেননা শুধু প্রাণহানি নয়, নতুন করে বিপন্ন মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রয়োজন। কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। দরিদ্র মানুষের (টি(জির উপরে টান পড়ে সবথেকে বেশি। তাই পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবিকার উপায় গড়ে তোলার পরিকাঠামো নির্মাণ করা চাই।

দেশে দেশে ত্রাণ নিয়ে জমে উঠেছে গভীর রাজনীতি। কে কতটা উদার সাজবে। কতটা সাহায্যের হাত বাড়ালে মনে করা যাবে, দাতার অমিত প্রভাব প্রতিপত্তির কথা। রাজনীতি না করে বা যতটা কম সম্ভব রাজনীতি করে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত।

সুযোগসন্ধানী মানুষ এই সুযোগে লুঠপাট চালায়। ত্রাণ নিয়ে অজস্র দুর্নীতির কথা শোনা যায়। কিছু অমানুষই বিপন্ন মানুষের অসহায়তার সুযোগ নেয়। ত্রাণকার্যে ধর্মবিভেদও এসে জড়ো হয়। এতে ধর্মকর্ম যতটা পালিত হয়, তার থেকে অনেক বেশি লালিত হয় অমানবিকতা।

২১। শেষকথা

আমরা প্রত্যেকে মানুষ বলে অগণিত মৃত মানুষের জন্যে শোক জানাই। দেশ জাতি ধর্ম ও ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে। সম্পদ নির্বিশেষে। অর্ধমৃত মানুষের জন্য দান ও সেবাকর্ম করতে মানুষ এগিয়ে আসুক।

ঋগ্বেদে ব(ণ অন্তরী'খ' ও সমুদ্রের দেবতা। মনে পড়ে যায় বেদের যুগে মানুষের কাতর

নিবেদন ছিল — হে ব(ণ, অনাদর করে হননকারী হয়ে তুমি আমাদের বধ কর না, ত্রু(দ্ধ হয়ে আমাদের উপর ক্রোধ প্রকাশ কর না। হে ব(ণ, আমার এ আহ্বান শ্রবণ কর, তোমার র'খ'ণাকাঙ্খী হয়ে আমি ডাকছি।

তাদের প্রার্থনাই একমাত্র সম্বল ছিল। আজো প্রায় তাই। এই জেট যুগে, এই বি(্বায়নের যুগে, এই গ্রহান্তরে পাড়ি জমানোর যুগে।

জারোয়া যুবতী ইয়াম তার স্বামী বাগম আর পুত্র টাবুটকে নিয়ে এসেছে সরকারী হাসপাতালে। টাবুটের পা ভেঙেছে। তাই চিকিৎসা দরকার। সেখানে তারা আছে বটে, তবে সভ্য জগতের হাজারো সুযোগ সুবিধে তাদের মন কাঁড়ে না। আদিম পৃথিবীর সন্তান তারা। অরণ্যে মুক্ত(প্রাণীর মতো অবাধে বিচরণ করতে চায়। সবুজ রঙের আলখাল্লাটাও বড্ড বাধবাধ লাগে। তারা জানে — পৃথিবী যখন কাঁপতে থাকে শিহরণে, তখন দূরে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে হয়। উঁচু ডাঙায়। নয়তো নাও নিয়ে চলে যেতে হয় গভীর সমুদ্রে। সমুদ্র তখন র'খ'া করে। আর প্রার্থনা জানাতে হয়।

সে দুলে দুলে আকুলকণ্ঠে বলছে — হে পৃথিবী, শান্ত হও, দোলা কমাও, যেন আমরা র'খ'া পাই, আর সকলে বাঁচে।

কোথাও পৌঁছয় কিনা জানি না তবে প্রার্থনার একটা মূল্য আছে। আমরাও প্রার্থনা জানাই — হে পৃথিবী শান্ত হও, হে মানুষ মানুষ হও, সকলে যেন বাঁচে।

তথ্যসূত্র ঃ (ক) 'Planet Earth' by Emiliani.
(খ) 'Modern Geology' by Yasamanov
(গ) Ashimov's New Guide to Science
(ঘ) নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ।